স্বদেশী সমাজ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্তচলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান। এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয়—তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ। যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম, তেমনি বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেলা।

এই মেলা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক। একটা সভা উপলক্ষে যদি দেশের লোককে ডাক দাও, তবে তাহারা সংশয় লইয়া আসিবে, তাহাদের মন খুলিতে অনেক দেরি হইবে—কিন্তু মেলা উপলক্ষে যাহারা একত্র হয় তাহারা সহজেই হৃদয় খুলিয়াই আসে—সুতরাং এইখানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে। পল্লীগুলি যেদিন হাল-লাঙল বন্ধ করিয়া ছুটি লইয়াছে, সেইদিনই তাহাদের কাছে আসিয়া বসিবার দিন।

বাংলাদেশে এমন জেলা নাই যেখানে নানা স্থানে বৎসরের নানা সময়ে মেলা না হইয়া থাকে—প্রথমত এই মেলাগুলির তালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করা আমাদের কর্তব্য। তাহার পরে এই-সমস্ত মেলাগুলির সূত্রে দেশের লোকের সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচিত হইবার উপলক্ষ আমরা যেন অবলম্বন করি।

প্রত্যেক জেলার ভদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের জেলার মেলাগুলিকে যদি নবভাবে জাগ্রত, নবপ্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষিতগণ যদি তাঁহাদের হৃদয় সঞ্চার করিয়া দেন, এই-সকল মেলায় যদি তাঁহারা হিন্দু-মুসুলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করেন—কোনোপ্রকার নিষ্ফল পলিটিক্সের সংস্রব না রাখিয়া বিদ্যালয়, পথঘাট, জলাশয়, গোচর-জমি প্রভৃতি সম্বন্ধে জেলার যে-সমস্ত অভাব আছে, তাহার প্রতিকারের পরামর্শ করেন, তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন।

আমার বিশ্বাস, যদি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাংলাদেশে নানা স্থানে মেলা করিবার জন্য এক দল লোক প্রস্তুত হন—তাঁহারা নূতন নূতন যাত্রা, কীর্তন, কথকতা রচনা করিয়া সঙ্গে বায়োস্কোপ,

Scanned with CamScanner

ম্যাজিকলণ্ঠন, ব্যায়াম ও ভোজবাজির আয়োজন লইয়া ফিরিতে থাকেন, তবে ব্যয়নির্বাহের জন্য তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র ভাবিতে হয় না। তাঁহারা যদি মোটের উপরে প্রত্যেক মেলার জন্য জমিদারকে একটা বিশেষ খাজনা ধরিয়া দেন এবং দোকানদারের নিকট হইতে যথানিয়মে বিক্রয়ের লভ্যাংশ আদায় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন—তবে উপযুক্ত সুব্যবস্থা দ্বারা সমস্ত ব্যাপারটাকে বিশেষ লাভকর করিয়া তুলিতে পারেন। এই লাভের টাকা হইতে পারিশ্রমিক ও অন্যান্য খরচ বাদে যাহা উদ্‌বৃত্ত হইবে, তাহা যদি দেশের কার্যেই লাগাইতে পারেন, তবে সেই মেলার দলের সহিত সমস্ত দেশের হৃদয়ের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবে—ইহারা সমস্ত দেশকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিবেন এবং ইঁহাদের দ্বারা যে কত কাজ হইতে পারিবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আমাদের দেশে চিরকাল আনন্দ-উৎসবের সূত্রে লোককে সাহিত্যরস ও ধর্মশিক্ষা দান করা হইয়াছে। সম্প্রতি নানা কারণবশতই অধিকাংশ জমিদার শহরে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের পুত্রকন্যার বিবাহাদি ব্যাপারে যাহা-কিছু আমোদ-আহ্লাদ, সমস্তই কেবল শহরের ধনী বন্ধুদিগকে থিয়েটার ও নাচগান দেখাইয়াই সম্পন্ন হয়। অনেক জমিদার ক্রিয়াকর্মে প্রজাদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিতে কুণ্ঠিত হন না— সে-স্থলে 'ইতরে জনাঃ' মিষ্টান্নের উপায় জোগাইতে থাকে, কিন্তু 'মিষ্টান্নম্' 'ইতরে জনাঃ' কণামাত্র ভোগ করিতে পায় না—ভোগ করেন 'বান্ধবাঃ' এবং 'সাহেবাঃ'। ইহাতে বাংলার গ্রামসকল দিনে দিনে নিরানন্দ হইয়া পড়িতেছে এবং যে সাহিত্যে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মনকে সরস ও শোভন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা প্রত্যহই সাধারণ লোকের আয়ত্তাতীত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই কল্পিত মেলা-সম্প্রদায় যদি সাহিত্যের ধারা, আনন্দের স্রোত বাংলার পল্লীদ্বারে আর-একবার প্রবাহিত করিতে পারেন, তবে এই শস্যশ্যামলা বাংলার অন্তঃকরণ দিনে দিনে শুষ্ক মরুভূমি হইয়া যাইবে না।

আমাদিগকে এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যে-সকল বড়ো বড়ো জলাশয় আমাদিগকে জলদান স্বাস্থ্যদান করিত, তাহারা দূষিত হইয়া কেবল যে আমাদের জলকষ্ট ঘটাইয়াছে তাহা নহে, তাহারা আমাদিগকে রোগ ও মৃত্যু বিতরণ করিতেছে—তেমনি আমাদের দেশে যে-সকল মেলা ধর্মের নামে প্রচলিত আছে, তাহাদেরও অধিকাংশ আজকাল ক্রমশ দূষিত হইয়া কেবল যে লোকশিক্ষার অযোগ্য হইয়াছে তাহা নহে, কুশিক্ষারও আকর হইয়া উঠিয়াছে। উপেক্ষিত শস্যক্ষেত্রে শস্যও হইতেছে না, কাঁটাগাছও জন্মিতেছে। এমন অবস্থায় কুৎসিত আমাদের উপলক্ষ এই মেলাগুলিকে যদি আমরা উদ্ধার না করি, তবে স্বদেশের কাছে ধর্মের কাছে অপরাধী হইব।

বিদেশী চিরদিন আমাদের স্বদেশকে অন্নজল ও বিদ্যা ভিক্ষা দিবে, আমাদের কর্তব্য কেবল এই যে, ভিক্ষার অংশ মনের মতো না হইলেই আমরা চীৎকার করিতে থাকিব? কদাচ

নহে, কদাচ নহে। স্বদেশের ভার আমরা প্রত্যেকেই এবং প্রতিদিনই গ্রহণ করিব—তাহাতে আমাদের গৌরব, আমাদের ধর্ম। এইবার সময় আসিয়াছে যখন আমাদের সমাজ একটি সুবৃহৎ স্বদেশী সমাজ হইয়া উঠিবে। সময় আসিয়াছে যখন প্রত্যেকে জানিবে আমি একক নহি—আমি ক্ষুদ্র হইলেও আমাকে কেহ ত্যাগ করিতে পারিবে না এবং ক্ষুদ্রতমকেও আমি ত্যাগ করিতে পারিব না।

তর্ক এই উঠিতে পারে যে, ব্যক্তিগত হৃদয়ের সম্বন্ধ দ্বারা খুব বড়ো জায়গা ব্যাপ্ত করা সম্ভবপর হইতে পারে না। একটা ছোটো পল্লীকেই আমরা প্রত্যক্ষভাবে আপনার করিয়া লইয়া তাহার সমস্ত দায়িত্ব স্বীকার করিতে পারি—কিন্তু পরিধি বিস্তীর্ণ করিলেই কলের দরকার হয়—দেশকে আমরা কখনোই পল্লীর মতো করিয়া দেখিতে পারি না—এইজন্য অব্যবহিত ভাবে দেশের কাজ করা যায় না, কলের সাহায্যে করিতে হয়। এই কল-জিনিসটা আমাদের ছিল না, সুতরাং ইহা বিদেশ হইতে আনাইতে হইবে এবং কারখানা-ঘরের সমস্ত সাজসরঞ্জাম-আইনকানুন গ্রহণ না করিলে কল চলিবে না।

কথাটা অসংগত নহে। কল পাতিতেই হইবে। এবং কলের নিয়ম যে-দেশী হউক-না কেন, তাহা মানিয়া না লইলে সমস্তই ব্যর্থ হইবে। এ কথা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও বলিতে হইবে, শুধু কলে ভারতবর্ষ চলিবে না—যেখানে আমাদের ব্যক্তিগত হৃদয়ের সম্বন্ধ আমরা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব না করিব, সেখানে আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। ইহাকে ভালোই বল আর মন্দই বল, গালিই দাও আর প্রশংসাই কর, ইহা সত্য। অতএব আমরা যে-কোনো কাজে সফলতা লাভ করিতে চাই, এই কথাটি আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে।

স্বদেশকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে চাই। এমন একটি লোক চাই, যিনি আমাদের সমস্ত সমাজের প্রতিমাস্বরূপ হইবেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের বৃহৎ স্বদেশীয় সমাজকে ভক্তি করিব, সেবা করিব। তাঁহার সঙ্গে যোগ রাখিলেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষিত হইবে।

এক্ষণে আমাদের সমাজপতি চাই। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পার্ষদসভা থাকিবে, কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সমাজের অধিপতি হইবেন।

আমাদের প্রত্যেকের নিকটে তাঁহারই মধ্যে সমাজের একতা সপ্রমাণ হইবে। আজ যদি কাহাকেও বলি সমাজের কাজ করো, তবে কেমন করিয়া করিব, কোথায় করিব, কাহার কাছে কী করিতে হইবে, তাহা ভাবিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া যাইবে। অধিকাংশ লোকেই আপনার কর্তব্য উদ্ভাবন করিয়া চলে না বলিয়াই রক্ষা। এমন স্থলে ব্যক্তিগত চেষ্টাগুলিকে নির্দিষ্ট পথে আকর্ষণ করিয়া লইবার জন্য একটি কেন্দ্র থাকা চাই। আমাদের সমাজের কোনো দল, সেই কেন্দ্রের স্থল

Scanned with CamScanner

অধিকার করিতে পারিবে না। আমাদের দেশে অনেক দলকেই দেখি, প্রথম উৎসাহের ধাক্কায় তাহারা যদি বা অনেকগুলি ফুল ফুটাইয়া তোলে কিন্তু শেষকালে ফল ধরাইতে পারে না। তাহার বিবিধ কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু একটা প্রধান কারণ—আমাদের দলের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মধ্যে দলের ঐক্যটিকে দৃঢ়ভাবে অনুভব ও রক্ষা করিতে পারে না—শিথিল দায়িত্ব প্রত্যেকের স্কন্ধ হইতে স্খলিত হইয়া শেষকালে কোথায় যে আশ্রয় লইবে, তাহার স্থান পায় না।

আমাদের সমাজ এখন আর এরূপভাবে চলিবে না। কারণ, বাহির হইতে যে উদ্যত শক্তি প্রত্যহ সমাজকে আত্মসাৎ করিতেছে, তাহা ঐক্যবদ্ধ, তাহা দৃঢ়—তাহা আমাদের বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিনের দোকানবাজার পর্যন্ত অধিকার করিয়া সর্বত্রই নিজের একাধিপত্য স্থূলসূক্ষ্ম সর্ব আকারেই প্রত্যক্ষগম্য করিয়াছে। এখন সমাজকে ইহার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে হইলে অত্যন্ত নিশ্চিতরূপে তাহার আপনাকে দাঁড় করাইতে হইবে। তাহা করাইবার একমাত্র উপায়—একজন ব্যক্তিকে অধিপতিত্বে বরণ করা, সমাজের প্রত্যেককে সেই একের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা, তাঁহার সম্পূর্ণ শাসন বহন করাকে অপমান জ্ঞান না করিয়া আমাদের স্বাধীনতারই অঙ্গ বলিয়া অনুভব করা।

এই সমাজপতি কখনো ভালো, কখনো মন্দ হইতে পারেন, কিন্তু সমাজ যদি জাগ্রত থাকে, তবে মোটের উপরে কোনো ব্যক্তি সমাজের স্থায়ী অনিষ্ট করিতে পারে না। আবার, এইরূপ অধিপতির অভিষেকই সমাজকে জাগ্রত রাখিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। সমাজ একটি বিশেষ স্থলে আপনার ঐক্যটি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিলে তাহার শক্তি অজেয় হইয়া উঠিবে।

ইঁহার অধীনে দেশের ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট অংশে ভিন্ন ভিন্ন নায়ক নিযুক্ত হইবেন। সমাজের সমস্ত অভাবমোচন, মঙ্গলকর্মচালনা ও ব্যবস্থারক্ষা ইঁহারা করিবেন এবং সমাজপতির নিকট দায়ী থাকিবেন।

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ অতি অল্পপরিমাণেও কিছু স্বদেশের জন্য উৎসর্গ করিবে। তা ছাড়া, প্রত্যেক গৃহে বিবাহাদি শুভকর্মে গ্রামভাটি* প্রভৃতির ন্যায় এই স্বদেশী সমাজের একটি প্রাপ্য আদায় দুরূহ বলিয়া মনে করি না। ইহা যথাস্থানে সংগৃহীত হইলে অর্থাভাব ঘটিবে না। আমাদের দেশে স্বেচ্ছাদত্ত দানে বড়ো বড়ো মঠমন্দির চলিতেছে, এ দেশে কি সমাজ ইচ্ছাপূর্বক আপনার আশ্রয়স্থান আপনি রচনা করিবে না? বিশেষত যখন অন্নে জলে স্বাস্থ্যে বিদ্যায় দেশ সৌভাগ্যলাভ করিবে, তখন কৃতজ্ঞতা কখনোই নিশ্চেষ্ট থাকিবে না।

---

* গ্রামবৃত্তি, বিবাহাদি, বারোয়ারি কাজের জন্য সংগৃহীত অর্থ—সম্পাদক

অবশ্য, এখন আমি কেবল বাংলাদেশকেই আমার চোখের সামনে রাখিয়াছি। এখানে সমাজের অধিনায়ক স্থির করিয়া আমাদের সামাজিক স্বাধীনতাকে যদি আমরা উজ্জ্বল ও স্থায়ী করিয়া তুলিতে পারি, তবে ভারতবর্ষের অন্যান্য বিভাগও আমাদের অনুবর্তী হইবে। এবং এইরূপে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশ যদি নিজের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট ঐক্য লাভ করিতে পারে, তবে পরস্পরের সহযোগিতা করা প্রত্যেকের পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়। একবার ঐক্যের নিয়ম এক স্থানে প্রবেশ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা ব্যাপ্ত হইতে থাকে—কিন্তু রাশীকৃত বিচ্ছিন্নতাকে কেবলমাত্র স্তূপাকার করিতে থাকিলেই তাহা এক হয় না।

আমাদের স্বদেশী সমাজের গঠন ও চালনের জন্য একই কালে আমরা সমাজপতি ও সমাজতন্ত্রের কর্তৃত্বসমন্বয় করিতে পারিব—আমরা স্বদেশকে একটি মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারিব এবং তাঁহার শাসন স্বীকার করিয়া স্বদেশী সমাজের যথার্থ সেবা করিতে পারিব।

আত্মশক্তি একটি বিশেষ স্থানে সঞ্চয় করা, সেই বিশেষ স্থানে উপলব্ধি করা, সেই বিশেষ স্থান হইতে সর্বত্র প্রয়োগ করিবার একটি ব্যবস্থা থাকা, আমাদের পক্ষে কিরূপ প্রয়োজনীয় হইয়াছে একটু আলোচনা করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। গবর্মেণ্ট নিজের কাজের সুবিধা অথবা যে কারণেই হোক, বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন—আমরা ভয় করিতেছি, ইহাতে বাংলাদেশ দুর্বল হইয়া পড়িবে।

দেশকে খণ্ডিত করিলে যে-সমস্ত অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহার প্রতিকার করিবার জন্য দেশের মধ্যে কোথাও কোনো ব্যবস্থা থাকিবে না? ব্যাধির বীজ বাহির হইতে শরীরের মধ্যে না প্রবেশ করিলেই ভালো— কিন্তু তবু যদি প্রবেশ করিয়া বসে, তবে শরীরের অভ্যন্তরে রোগকে ঠেকাইবার স্বাস্থ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার কোনো কর্তৃশক্তি কি থাকিবে না। সেই কর্তৃশক্তি যদি আমরা সমাজের মধ্যে সুদৃঢ় সুস্পষ্ট করিয়া রাখি, তবে বাহির হইতে বাংলাকে নির্জীব করিতে পারিবে না। সমস্ত ক্ষতকে আরোগ্য করা, ঐক্যকে আকর্ষণ করিয়া রাখা, মূর্ছিতকে সচেতন করিয়া তোলা ইহারই কর্ম হইবে।

আমাদের দেশে মধ্যে মধ্যে সামান্য উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বাধিয়া উঠে, সেই বিরোধ মিটাইয়া দিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে প্রীতিশান্তিস্থাপন, উভয় পক্ষের স্ব স্ব অধিকার নিয়মিত করিয়া দিবার বিশেষ কর্তৃত্ব সমাজের কোনো স্থানে যদি না থাকে, তবে সমাজকে বারে বারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উত্তরোত্তর দুর্বল হইতে হয়।

অতএব একটি লোককে আশ্রয় করিয়া আমাদের সমাজকে এক জায়গায় আপন হৃদয়স্থাপন, আপন ঐক্যপ্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে, নহিলে শৈথিল্য ও বিনাশের হাত হইতে আত্মরক্ষার কোনো উপায় দেখি না।

Scanned with CamScanner

অনেক হয়তো সাধারণভাবে আমার এ কথা স্বীকার করিবেন, কিন্তু ব্যাপারখানা ঘটাইয়া তোলা তাঁহারা অসাধ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন। তাঁহারা বলিবেন—নির্বাচন করিব কী করিয়া, সবাই নির্বাচিতকে মানিবে কেন, আগে সমস্ত ব্যবস্থাতন্ত্র স্থাপন করিয়া তবে তো সমাজপতির প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে, ইত্যাদি।

আমার বক্তব্য এই যে, এই সমস্ত তর্ক লইয়া আমরা যদি একেবারে নিঃশেষপূর্বক বিচার বিবেচনা করিয়া লইতে বসি, তবে কোনো কালে কাজে নামা সম্ভব হইবে না। এমন লোকের নাম করাই শক্ত, দেশের কোনো লোক বা কোনো দল যাঁহার সম্বন্ধে কোনো আপত্তি না করিবেন। দেশের সমস্ত লোকের সঙ্গে পরামর্শ মিটাইয়া লইয়া লোককে নির্বাচন করা সাধ্য হইবে না।

আমাদের প্রথম কাজ হইবে— যেমন করিয়া হউক, একটি লোক স্থির করা এবং তাঁহার নিকটে বাধ্যতা স্বীকার করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে তাঁহার চারি দিকে একটি ব্যবস্থাতন্ত্র গড়িয়া তোলা।

কোনো একটি যোগ্য লোককে দাঁড় করাইয়া তাঁহার অধীনে এক দল লোক যথার্থভাবে কাজে প্রবৃত্ত হইলে এই সমাজরাজতন্ত্র দেখিতে দেখিতে প্রস্তুত হইয়া উঠিবে—পূর্ব হইতে হিসাব করিয়া কল্পনা করিয়া আমরা যা আশা করিতে না পারিব, তাহাও লাভ করিব—সমাজের অন্তর্নিহিত বুদ্ধি এই ব্যাপারের চালনাভার আপনিই গ্রহণ করিবে।

সমাজে অবিচ্ছিন্নভাবে সকল সময়েই শক্তিমান ব্যক্তি থাকেন না, কিন্তু দেশের শক্তি বিশেষ-বিশেষ স্থানে পুঞ্জীভূত হইয়া তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করে। যে-শক্তি আপাতত যোগ্য লোকের অভাবে কাজে লাগিল না, সে-শক্তি যদি সমাজে কোথাও রক্ষিত হইবার স্থানও না পায়, তবে সে সমাজ ফুটা কলসের মতো শূন্য হইয়া যায়। আমি যে সমাজপতির কথা বলিতেছি, তিনি সকল সময়ে যোগ্য লোক না হইলেও সমাজের শক্তি, সমাজের আত্মচেতনা তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বিধৃত হইয়া থাকিবে। অবশেষে বিধাতার আশীর্বাদে এই শক্তিসঞ্চয়ের সঙ্গে যখন যোগ্যতার যোগ হইবে, তখন দেশের মঙ্গল দেখিতে দেখিতে আশ্চর্যবলে আপনাকে সর্বত্র বিস্তীর্ণ করিবে।

সমাজের সকলের চেয়ে যাঁহাকে বড়ো করিব, এতবড়ো লোক চাহিলেই পাওয়া যায় না। বস্তুত রাজা তাঁহার সকল প্রজারই চেয়ে যে স্বভাবত বড়ো, তাহা নহে। কিন্তু রাজাই রাজাকে বড়ো করে। জাপানের মিকাডো জাপানের সমস্ত সুধী, সমস্ত সাধক, সমস্ত শূরবীরদের দ্বারাই বড়ো। আমাদের সমাজপতিও সমাজের মহত্ত্বেই মহৎ হইতে থাকিবেন। সমাজের সমস্ত বড়ো লোকই তাঁহাকে বড়ো করিয়া তুলিবে। মন্দিরের মাথায় যে স্বর্ণকলস থাকে, তাহা নিজে উচ্চ নহে—মন্দিরের উচ্চতাই তাহাকে উচ্চ করে।

আমি কেবল এইটুকুমাত্র বলিব, আসুন আমরা মনকে প্রস্তুত করি—ক্ষুদ্র দলাদলি, কুতর্ক, পরনিন্দা, সংশয় ও অতিবুদ্ধি হইতে হৃদয়কে সম্পূর্ণভাবে ক্ষালন করিয়া অদ্য মাতৃভূমির বিশেষ প্রয়োজনের দিনে, জননীর বিশেষ আহ্বানের দিনে চিত্তকে উদার করিয়া কর্মের প্রতি অনুকূল করিয়া, সর্বপ্রকার লক্ষ্যবিহীন অতি সূক্ষ্ম যুক্তিবাদের ভণ্ডুলতাকে সবেগে আবর্জনাস্তূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, এবং নিগূঢ় আত্মাভিমানকে তাহার শতসহস্র রক্ততৃষ্ণার্ত শিকড় সমেত হৃদয়ের অন্ধকার গুহ্যতল হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া সমাজের শূন্য আসনে বিনম্র-বিনীতভাবে আমাদের সমাজপতির অভিষেক করি, আশ্রয়চ্যুত সমাজকে সনাথ করি।

Scanned with CamScanner

বাঙ্গালা ভাষা

স্বামী বিবেকানন্দ

আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন, বিদ্বান্ এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত—যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট ; কিন্তু কটমট ভাষা—যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের ক'রে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর ; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় তো নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও-সকল তত্ত্ববিচার কেমন ক'রে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালোবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না ; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোনো তৈরি-ভাষা কোনো কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ্ ইস্পাত মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা—সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল—ঐ এক চাল নকল ক'রে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়—লক্ষণ।

যদি বল ও কথা বেশ ; তবে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা। পূর্ব-পশ্চিম, যে দিক্ হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি সেই ভাষাই লোকে কয়। তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্ ভাষা লিখতে হবে, যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে তত পূর্ব-পশ্চিমী ভেদ উঠে যাবে, এবং চট্টগ্রাম হ'তে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত ঐ কলকেতার ভাষাই চলবে। কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশি নিকট, সে কথা হচ্ছে না—কোন্ ভাষা জিতছে সেইটি দেখ। যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই

Scanned with CamScanner

অল্পদিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে-কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান্ অবশ্যই কলকেতার ভাষাকেই ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন। এথায় গ্রাম্য ঈর্ষাটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে। সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটি ভুলে যেতে হবে। ভাষা ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান ; ভাষা পরে। হীরে-মোতির সাজ-পরানো ঘোড়ার উপর বাঁদর বসালে কি ভালো দেখায়? সংস্কৃতর দিকে দেখ দেখি। 'ব্রাহ্মণে'র সংস্কৃত দেখ, শবর স্বামীর 'মীমাংসাভাষ্য' দেখ, পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' দেখ, শেষ—আচার্য শংকরের ভাষ্য দেখ, আর অর্বাচীনকালের সংস্কৃত দেখ। এখুনি বুঝতে পারবে যে, যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু-একটা পচাভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ রে, সে কি ধুম-দশপাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম ক'রে—'রাজা আসীৎ' !!! আহা হা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ !! — ও-সব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হ'ল, তখন এই-সব চিহ্ন উদয় হ'ল। ওটি শুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল। বাড়িটার না আছে ভাব, না ভঙ্গি ; থামগুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা করে দিলে। গয়নাটা নাক ফুঁড়ে ঘাড় ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নায় লতা-পাতা চিত্র-বিচিত্রর কি ধুম !!! গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে-তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝতে পারেন না ; আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম ! সে কি আঁকাবাঁকা ডামাডোল—ছত্রিশ নাড়ীর টান তাই রে বাপ ! তার উপর মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে, নাকের মধ্য দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব ! এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সংগীত কোনো কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সংগীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু-হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মূর্তি দেখলেই ভক্তি হবে, গহনা-পরা মেয়ে-মাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ি ঘর দোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগমগ করবে।

Scanned with CamScanner

স্ত্রীজাতির অবনতি

বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন

আমাদের শয়ন-কক্ষে যেমন সূর্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রূপ মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পায় না। যেহেতু আমাদের উপযুক্ত স্কুল কলেজ একপ্রকার নাই। পুরুষ যত ইচ্ছা অধ্যয়ন করিতে পারেন—কিন্তু আমাদের নিমিত্ত জ্ঞানরূপ সুধাভাণ্ডারের দ্বার কখনও সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইবে কি? যদি কোন উদারচেতা মহাত্মা দয়া করিয়া আমাদের হাত ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সহস্র জনে বাধাবিঘ্ন উপস্থিত করেন।

সহস্র জনের বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া একজনের কার্য নহে। তাই একটু আশার আলোক-দীপ্তি পাইতে-না পাইতে চির নিরাশার অন্ধকারে বিলীন হয়। স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে অধিকাংশে লোকের কেমন একটা কুসংস্কার আছে যে, তাঁহারা "স্ত্রীশিক্ষা" শব্দ শুনিলেই "শিক্ষার কুফলের" একটা ভাবী বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শত দোষ সমাজ অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া থাকে, কিন্তু সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলা দোষ না করিলেও সমাজ কোন কল্পিত দোষ শতগুণ বাড়াইয়া সে বেচারীর ঐ "শিক্ষার" ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় এবং শত কণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে "স্ত্রীশিক্ষাকে নমস্কার"।

আজি কালি অধিকাংশ লোকে শিক্ষাকে কেবল চাকুরী লাভের পথ মনে করে। মহিলাগণের চাকুরী গ্রহণ অসম্ভব, সুতরাং এই সকল লোকের চক্ষে স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

আমাদের উচিত যে, স্বহস্তে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করি। এক স্থলে আমি বলিয়াছি, "ভরসা কেবল পতিতপাবন", কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ঊর্ধ্বে হস্ত উত্তোলন না করিলে পতিতপাবনও হাত ধরিয়া তুলিবেন না। ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য করেন, যে নিজে নিজের সাহায্য করে ("God helps those that helps themselves")। তাই বলি আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না। ভাবিলেও তাহাতে আমাদের ষোল আনা উপকার হইবে না।

অনেকে মনে করেন যে, পুরুষের উপার্জিত ধন ভোগ করে বলিয়া নারী তাহার প্রভুত্ব সহ্য করে। কথাটা অনেক পরিমাণে ঠিক। বোধ হয়, স্ত্রীজাতি প্রথমে শরীরিক শ্রমে অক্ষম হইয়া

পরের উপার্জিত ধনভোগে বাধ্য হয় এবং সেইজন্যে তাহাকে মস্তক নত করিতে হয়। কিন্তু এখন স্ত্রীজাতির মন পর্যন্ত দাস (enslaved) হওয়ায় দেখা যায়, যে স্থলে দরিদ্রা স্ত্রীলোকেরা সূচির্ক বা দাসীবৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া পতি পুত্র প্রতিপালন করে, সেখানেও ঐ অকর্মণ্য পুরুষেরাই "স্বামী" থাকে। আবার যিনি স্বয়ং উপার্জন না করিয়া প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করেন তিনিও ত স্ত্রীর উপর প্রভুত্ব করেন এবং স্ত্রী তাঁহার প্রভুত্বে আপত্তি করেন না। ইহার কারণ এই যে, বহুকাল হইতে নারী-হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায়, নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিষ্ক, হৃদয় সবই "দাসী" হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর আমাদের স্বাধীনতা, ওজস্বিতা বলিয়া কোন বস্তু নাই—এবং তাহা লাভ করিবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত লক্ষিত হয় না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কি করিলে লুপ্ত রত্ন উদ্ধার হইবে? কি করিলে আমরা দেশের উপযুক্ত কন্যা হইব? প্রথমতঃ সাংসারিক জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলিবার ইচ্ছা অথবা দৃঢ় সংকল্প আবশ্যিক এবং আমরা যে গোলাম জাতি নই, এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডী-কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী-ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী-ব্যারিস্টার, লেডী-জজ — সবই হইব। পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডী Viceroy হইয়া এ দেশের সমস্ত নারীকে "রানী" করিয়া ফেলিব। উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই? যে পরিশ্রম আমরা "স্বামী"র গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?.....

আমরা যদি রাজকীয় কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিব। ভারতে বর দুর্লভ হইয়াছে বলিয়া কন্যাদায়ে কাঁদিয়া মরি কেন? কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্যক্ষেত্রেও ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক।

যদি বল, আমরা দুর্বলভুজা, মূর্খ, হীন বুদ্ধি নারী। সে দোষ কাহার? আমাদের। আমরা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তাহা হীনতেজ হইয়াছে। এখন অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করিব। যে বাহু-লতা পরিশ্রম না করায় হীনবল হইয়াছে, তাহাকে খাটাইয়া সবল করিলে হয় না? এখন একবার জ্ঞানচর্চা করিয়া দেখি ত এ অনুর্বর মস্তিষ্ক (dull head) সুতীক্ষ্ণ হয় কি না।

পরিশেষে বলি, আমরা সমাজেরই অর্ধঅঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে?

Scanned with CamScanner

পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে — একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতামাতা—উভয়েরই সমান দরকার। কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে—সর্বত্র আমরা যাহাতে তাঁহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের অবশ্যক। প্রথমতঃ উন্নতির পথে তাঁহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন—আমরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম। এখন তাঁহারা উন্নতিরাজ্যে গিয়া দেখিতেছেন সেখানে তাঁহাদের সঙ্গিনী নাই বলিয়া তাঁহারা একাকী হইয়া আছেন। তাই আবার ফিরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইতেছেন এবং জগতের যে সকল সমাজের পুরুষেরা সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন। আমাদের উচিত যে, তাঁহাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝা বিশেষ না হইয়া আমরা সহচরী, সহকর্মিণী, সহধর্মিণী ইত্যাদি হইয়া তাঁহাদের সহায়তা করি। আমরা অকর্মণ্য পুতুল-জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, একথা নিশ্চিত।

Scanned with CamScanner

অপবিজ্ঞান

রাজশেখর বসু

বিজ্ঞানচর্চার প্রসারের ফলে প্রাচীন অন্ধসংস্কার ক্রমশ দূর হইতেছে। কিন্তু যাহা যাইতেছে তাহার স্থানে নূতন জঞ্জাল কিছু কিছু জমিতেছে। ধর্মের বুলি লইয়া যেমন অপধর্ম সৃষ্ট হয়, তেমনি বিজ্ঞানের বুলি লইয়া অপবিজ্ঞান গড়িয়া উঠে। সকল দেশেই বিজ্ঞানের নামে অনেক নূতন ভ্রান্তি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ছদ্মবেশে যেসকল ভ্রান্ত ধারণা এদেশে লোকপ্রিয় হইয়াছে, তাহারই কয়েকটির কথা বলিতেছি।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য—বিদ্যুৎ। তীব্র উপহাসের ফলে এই শব্দটির প্রয়োগে আজকাল কিঞ্চিৎ সংযম আসিয়াছে। টিকিতে বিদ্যুৎ পইতায় বিদ্যুৎ, গঙ্গাজলে বিদ্যুৎ—এখন বড় একটা শোনা যায় না। গল্প শুনিয়াছি, এক সভায় পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি অগস্ত্যমুনির সমুদ্রশোষণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। অগস্ত্যের ক্রুদ্ধ চক্ষু হইতে এমন প্রচণ্ড বিদ্যুৎস্রোত নির্গত হইল যে সমস্ত সমুদ্রের জল এক নিমেষে বিশ্লিষ্ট হইয়া হাইড্রোজেন অক্সিজেন রূপে উবিয়া গেল। সকলে অবাক হইয়া এই ব্যাখ্যা শুনিল, কেবল একজন ধৃষ্ট শ্রোতা বলিল—'আরে না মশায়, আপনি জানেন না, চোঁ ক'রে মেরে দিয়েছিল'।

বিদ্যুতের মহিমা কমিলেও একেবারে লোপ পায় নাই। বৈদ্যুতিক সালসা বৈদ্যুতিক আংটি বাজারে সুপ্রচলিত। অষ্টধাতুর মাদুলির গুণ এখন আর শাস্ত্র বা প্রবাদের উপর নির্ভর করে না। ব্যাটারিতে দুই রকম ধাতু থাকে বলিয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, অতএব অষ্টধাতুর উপযোগিতা আরও বেশী না হইবে কেন !

উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া শুইতে নাই, শাস্ত্রে বারণ আছে। শাস্ত্র কারণ নির্দেশ করে না সুতরাং বিজ্ঞানকে সাক্ষী মানা হইয়াছে। পৃথিবী একটি প্রকাণ্ড চুম্বক, মানুষের দেহও নাকি চুম্বকধর্মী। অতএব উত্তরমেরুর দিকে মাথা না রাখাই যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু দক্ষিণমেরু নিরাপদ কেন হইল তাহার কারণ কেহ দেন নাই।

জোনাকিপোকা প্রদীপে পুড়িলে যে ধুঁয়া বাহির হয় তাহা অত্যন্ত বিষ এই প্রবাদ বহুপ্রচলিত। অপবিজ্ঞান বলে—জোনাকি হইতে আলোক বাহির হয় অতএব তাহাতে প্রচুর ফসফরস আছে, এবং ফসফরসের ধুঁয়া মারাত্মক বিষ। প্রকৃত কথা—ফসফরস যখন মৌলিক অবস্থায় থাকে তখন

Scanned with CamScanner

বায়ুর স্পর্শে তাহা হইতে আলোক বাহির হয়, এবং ফসফরস বিষও বটে। কিন্তু জোনাকির আলোক ফসফরস-জনিত নয়। প্রাণিদেহ মাত্রেই কিঞ্চিৎ ফসফরস আছে, কিন্তু তাহা যৌগিক অবস্থায় আছে, এবং তাহাতে বিষধর্ম নাই। এক টুকরা মাছে যত ফসফরস আছে, একটি জোনাকিতে তাহার অপেক্ষা অনেক কম আছে। মাছ-পোড়া যেমন নিরাপদ, জোনাকি-পোড়াও তেমন।

কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক নামের একটা মোহিনী শক্তি আছে, লোকে সেই নাম শিখিলে স্থানে অস্থানে প্রয়োগ করে। 'গাটাপার্চা' এইরকম একটি মুখরোচক শব্দ। ফাউন্টেন পেন চিরুনি চশমার ফ্রেম প্রভৃতি বহু বস্তুর উপাদানকে লোকে নির্বিচারে গাটাপার্চা বলে। গাটাপার্চা রবারের ন্যায় বৃক্ষবিশেষের নির্যাস। ইহাতে বৈদ্যুতিক তারের আবরণ হয়, জলরোধক বার্নিশ হয়, ডাক্তারি চিকিৎসায় ইহার পাত ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সাধারণত লোকে যাহাকে গাটাপার্চা বলে তাহা অন্য বস্তু। আজকাল যেসকল শৃঙ্গবৎ কৃত্রিম পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে তাহার কথা সংক্ষেপে বলিতেছি।—

নাইট্রিক অ্যাসিড তুলা ইত্যাদি হইতে সেলিউলয়েড হয়। ইহা কাচতুল্য স্বচ্ছ, কিন্তু অন্য উপাদান যোগে রঞ্জিত চিত্রিত বা হাতির দাঁতের ন্যায় সাদা করা যায়। ফোটোগ্রাফের ফিল্ম, মোটর গাড়ির জানালা, হার্মোনিয়মের চাবি, পুতুল, চিরুনি, বোতাম প্রভৃতি অনেক জিনিসের উপাদান সেলিউলয়েড। অনেক চশমার ফ্রেমও এই পদার্থ।

রবারের সহিত গন্ধক মিলাইয়া ইবনাইট বা ভল্‌কানাইট প্রস্তুত হয়। বাংলায় ইহাকে 'কাচকড়া' বলা হয়, যদিও কাচকড়ার মূল অর্থ কাছিমের খোলা। ইবনাইট স্বচ্ছ নয়। ইহা হইতে ফাউন্টেন পেন চিরুনি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

আরও নানাজাতীয় স্বচ্ছ বা শৃঙ্গবৎ পদার্থ বিভিন্ন নামে বাজারে চলিতেছে, যথা—সেলোফেন, ভিসকোজ, গ্যালালিথ, ব্যাকেলাইট ইত্যাদি। এগুলির উপাদান ও প্রস্তুতপ্রণালী বিভিন্ন। নকল রেশম, নকল হাতির দাঁত, নানারকম বার্নিশ, বোতাম, চিরুনি প্রভৃতি বহু শৌখিন জিনিস ঐসকল পদার্থ হইতে প্রস্তুত হয়।

আর একটি ভ্রান্তিকর নাম সম্প্রতি সৃষ্টি হইয়াছে—'আলপাকা শাড়ি'। আলপাকা একপ্রকার পশমী কাপড়। কিন্তু আলপাকা শাড়িতে পশমের লেশ নাই, ইহা কৃত্রিম রেশম হইতে প্রস্তুত।

টিন শব্দের অপপ্রয়োগ আমরা ইংরেজের কাছে শিখিয়াছি। ইহার প্রকৃত অর্থ রাং, ইংরেজীতে তাহাই মুখ্য অর্থ। কিন্তু আর এক অর্থ—রাং-এর লেপ দেওয়া লোহার পাত অথবা তাহা হইতে প্রস্তুত আধার, যথা 'কেরোসিনের টিন'। ঘর ছাহিবার করুগেটেড লোহায় দস্তার লেপ থাকে। তাহাও 'টিন' আখ্যা পাইয়াছে, যথা 'টিনের ছাদ'।

আজকাল মনোবিদ্যার উপর শিক্ষিত জনের প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছে, তাহার ফলে এই বিদ্যার বুলি সর্বত্র শোনা যাইতেছে। Psychological moment কথাটি বহুদিন হইতে সংবাদপত্র ও বক্তৃতার অপরিহার্য বুকনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি আর একটি শব্দ চলিতেছে—complex। অমুক লোক ভীরু বা অন্যের অনুগত, অতএব তাহার inferiority complex আছে। অমুক লোক সাঁতার দিতে ভালবাসে, অতএব তাহার water complex আছে। বিজ্ঞানীর দুর্ভাগ্য—তিনি মাথা ঘামাইয়া যে পরিভাষা রচনা করেন সাধারণে তাহা কাড়িয়া লইয়া অপপ্রয়োগ করে, এবং অবশেষে একটা বিকৃত কদর্থ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া বিজ্ঞানীকে স্বাধিকারচ্যুত করে।

বিজ্ঞানের লক্ষ্য—জটিলকে অপেক্ষাকৃত সরল করা, বহু বিসদৃশ ব্যাপারের মধ্যে যোগসূত্র বাহির করা। বিজ্ঞান নির্ধারণ করে—অমুক ঘটনার সহিত অমুক ঘটনার অখণ্ডনীয় সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ ইহাতে এই হয়। কেন হয় তাহার চূড়ান্ত জবাব বিজ্ঞান দিতে পারে না। গাছ হইতে স্খলিত হইলে ফল মাটিতে পড়ে ; কারণ বলা হয়—পৃথিবীর আকর্ষণ। কেন আকর্ষণ করে বিজ্ঞান এখনও জানে না। জানিতে পারিলেও আবার নূতন সমস্যা উঠিবে। নিউটন আবিষ্কার করিয়াছেন, জড়পদার্থ মাত্রই পরস্পর আকর্ষণ করে। জড়ের এই ধর্মের নাম মহাকর্ষ বা gravitation। এই আকর্ষণের রীতি নির্দেশ করিয়া নিউটন যে সূত্র রচনা করিয়াছেন তাহা law of gravitation, মহাকর্ষের নিয়ম। ইহাতে আকর্ষণের হেতুর উল্লেখ নাই। মানুষ মাত্রই মরে ইহা অবধারিত সত্য বা প্রাকৃতিক নিয়ম। মানুষের এই ধর্মের নাম মরত্ব। কিন্তু মৃত্যুর কারণ মরত্ব নয়।

বিজ্ঞানশাস্ত্র বারংবার সতর্ক করিয়াছে—মানুষ যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছে তাহা ঘটনার লক্ষিত রীতি মাত্র, ঘটনার কারণ নয়, laws are not causes। যাহাকে আমরা কারণ বলি তাহা ব্যাপারপরম্পরা বা ঘটনার সম্বন্ধ মাত্র, তাহার শেষ নাই ইয়াত্তা নাই। যাহা চরম ও নিরপেক্ষ কারণ তাহা বিজ্ঞানীর অনধিগম্য। দার্শনিক স্মরণাতীত কাল হইতে তাহার সন্ধান করিতেছেন।

Scanned with CamScanner

পোস্টমাস্টার

প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াই উলাপুর গ্রামে পোস্টমাস্টারকে আসিতে হয়। গ্রামটি অতি সামান্য। নিকটে একটি নীলকুঠি আছে, তাই কুঠির সাহেব অনেক জোগাড় করিয়া এই নূতন পোস্ট-আপিস স্থাপন করাইয়াছে।

আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে। জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যে-রকম হয়, এই গণ্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাঁহার আপিস ; অদূরে একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারি পাড়ে জঙ্গল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে-সকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফুরসত প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।

বিশেষত কলিকাতার ছেলে ভালো করিয়া মিশিতে জানে না। অপরিচিত স্থানে গেলে, হয় উদ্ধত নয় অপ্রতিভ হইয়া থাকে। এই কারণে স্থানীয় লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা হইয়া উঠে না। অথচ হাতে কাজ অধিক নাই। কখনো-কখনো দুটো-একটা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে এমন ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সমস্তদিন তরুপল্লবের কম্পন এবং আকাশের মেঘ দেখিয়া জীবন বড়ো সুখে কাটিয়া যায়—কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি আরব্য উপন্যাসের কোনো দৈত্য আসিয়া এক রাত্রের মধ্যে এই শাখাপল্লবসমেত সমস্ত গাছগুলা কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয়, এবং সারি সারি অট্টালিকা আকাশের মেঘকে দৃষ্টিপথ হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।

পোস্টমাস্টারের বেতন অতি সামান্য। নিজে রাঁধিয়া খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা তাঁহার কাজকর্ম করিয়া দেয়, চারিটি-চারিটি খাইতে পায়। মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো-তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোলকরতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়িয়া দিত—যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবিহৃদয়েও ঈষৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোস্টমাস্টার

ডাকিতেন 'রতন'। রতন দ্বারে বসিয়া এই ডাকের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত কিন্তু এক ডাকেই ঘরে আসিত না—বলিত, 'কী গা বাবু কেন ডাকছ।'

পোস্টমাস্টার। তুই কী করছিস।

রতন। একনি চুলো ধরাতে যেতে হবে — ঠেশোলের —

পোস্টমাস্টার। তোর ঠেশোলের কাজ পরে হবে এখন — একবার তামাকটা সেজে দে তো।

অনতিবিলম্বে দুটি গাল ফুলাইয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রতনের প্রবেশ। হাত হইতে কলিকাটা লইয়া পোস্টমাস্টার ফস করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'আচ্ছা রতন, তোর মাকে মনে পড়ে?' সে অনেক কথা ; কতক মনে পড়ে, কতক মনে পড়ে না। মায়ের চেয়ে বাপ তাহাকে বেশি ভালোবাসিত, বাপকে অল্প অল্প মনে আছে। পরিশ্রম করিয়া বাপ সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিত, তাহারি মধ্যে বোধ হয় দুটি-একটি সন্ধ্যা তাহার মনে পরিষ্কার ছবির মতো অঙ্কিত আছে। এই কথা হইতে হইতে ক্রমে রতন পোস্টমাস্টারের পায়ের কাছে মাটির উপর বসিয়া পড়িত। মনে পড়িত তাহার একটি ছোটো ভাই ছিল— বহু পূর্বেকার বর্ষার দিনে একদিন একটা ডোবার ধারে দুইজনে মিলিয়া গাছের ভাঙা ডালকে ছিপ করিয়া মিছামিছি মাছধরা খেলা করিয়াছিল— অনেক গুরুতর ঘটনার চেয়ে সেই কথাটাই তাহার মনে বেশি উদয় হইত। এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে মাঝে-মাঝে বেলা বেশি হইয়া যাইত, তখন আলস্যক্রমে পোস্টমাস্টারের আর রাঁধিতে ইচ্ছা করিত না। সকালের বাসি ব্যঞ্জন থাকিত এবং রতন তাড়াতাড়ি উনুন ধরাইয়া খানকয়েক রুটি সেঁকিয়া আনিত—তাহাতেই উভয়ের রাত্রের আহার চলিয়া যাইত।

এক-এক দিন সন্ধ্যাবেলায় সেই বৃহৎ আটচালার কোণে আপিসের কাঠের চৌকির উপর বসিয়া পোস্টমাস্টারও নিজের ঘরের কথা পাড়িতেন— ছোটোভাই, মা এবং দিদির কথা, প্রবাসে একলা ঘরে বসিয়া যাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত তাহাদের কথা। যে-সকল কথা সর্বদাই মনে উদয় হয় অথচ নীলকুঠির গোমস্তাদের কাছে যাহা কোনোমতেই উত্থাপন করা যায় না, সেই কথা একটি অশিক্ষিত ক্ষুদ্র বালিকাকে বলিয়া যাইতেন, কিছুমাত্র অসংগত মনে হইত না। অবশেষে এমন হইল, বালিকা কথোপকথনকালে তাঁহার ঘরের লোকদিগকে মা, দিদি, দাদা বলিয়া চিরপরিচিতের ন্যায় উল্লেখ করিত। এমন-কি, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়পটে বালিকা তাঁহাদের কাল্পনিক মূর্তিও চিত্রিত করিয়া লইয়াছিল।

একদিন বর্ষাকালের মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ-তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল, রৌদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উত্থিত হইতেছিল, মনে হইতেছিল যেন ক্লান্ত ধরণীর উষ্ণ নিশ্বাস গায়ের উপর আসিয়া লাগিতেছে, এবং কোথাকার এক

Scanned with CamScanner

নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটা একটানা সুরের নালিশ সমস্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুণস্বরে বার বার আবৃত্তি করিতেছিল। পোস্টমাস্টারের হাতে কাজ ছিল না— সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবিশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল; পোস্টমাস্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময়ে কাছে একটি-কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত— হৃদয়ের সহিত একান্তসংলগ্ন একটি স্নেহপুত্তলির মানবমূর্তি। ক্রমে মনে হইতে লাগিল, সেই পাখি ঐ কথাই বার বার বলিতেছে এবং এই জনহীন তরুচ্ছায়ানিমগ্ন মধ্যাহ্নের পল্লবমর্মরের অর্থও কতকটা ঐরূপ। কেহ বিশ্বাস করে না, এবং জানিতেও পায় না, কিন্তু ছোটো পল্লীর সামান্য বেতনের সাব-পোস্টমাস্টারের মনে গভীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে দীর্ঘ ছুটির দিনে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

পোস্টমাস্টার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন 'রতন'। রতন তখন পেয়ারাতলায় পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেয়ারা খাইতেছিল; প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অবিলম্বে ছুটিয়া আসিল— হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'দাদাবাবু, ডাকছ?' পোস্টমাস্টার বলিলেন, 'তোকে আমি একটু একটু করে পড়তে শেখাব।' বলিয়া সমস্ত দুপুরবেলা তাহাকে লইয়া 'স্বরে অ' 'স্বরে আ' করিলেন। এবং এইরূপে অল্পদিনেই যুক্ত-অক্ষর উত্তীর্ণ হইলেন।

শ্রাবণমাসে বর্ষণের আর অন্ত নাই। খাল বিল নালা জলে ভরিয়া উঠিল। অহর্নিশি ভেকের ডাক এবং বৃষ্টির শব্দ। গ্রামের রাস্তায় চলাচল প্রায় একপ্রকার বন্ধ— নৌকায় করিয়া হাটে যাইতে হয়।

একদিন প্রাতঃকাল হইতে খুব বাদলা করিয়াছে। পোস্টমাস্টারের ছাত্রীটি অনেকক্ষণ দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু অন্যদিনের মতো যথাসাধ্য নিয়মিত ডাক শুনিতে না পাইয়া আপনি খুঙ্গিপুঁথি লইয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, পোস্টমাস্টার তাঁহার খাটিয়ার উপর শুইয়া আছেন— বিশ্রাম করিতেছেন মনে করিয়া অতি নিঃশব্দে পুনশ্চ ঘর হইতে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। সহসা শুনিল 'রতন'। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গিয়া বলিল, 'দাদাবাবু ঘুমোচ্ছিলে?' পোস্টমাস্টার কাতরস্বরে বলিলেন, 'শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না— দেখ্ তো আমার কপালে হাত দিয়ে।'

এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তপ্ত ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগযন্ত্রণায় স্নেহময়ী নারীরূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন, এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে। এবং এ স্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইল না। বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল,

বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল, এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁগো দাদাবাবু, একটুখানি ভালো বোধ হচ্ছে কি?'

বহুদিন পরে পোস্টমাস্টার ক্ষীণ শরীরে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন— মনে স্থির করিলেন, আর নয়, এখান হইতে কোনোমতে বদলি হইতে হইবে। স্থানীয় অস্বাস্থ্যের উল্লেখ করিয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় কর্তৃপক্ষদের নিকট বদলি হইবার জন্য দরখাস্ত করিলেন।

রোগসেবা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রতন দ্বারের বাহিরে আবার তাহার স্বস্থান অধিকার করিল। কিন্তু পূর্ববৎ আর তাহাকে ডাক পড়ে না। মাঝে-মাঝে উঁকি মারিয়া দেখে, পোস্টমাস্টার অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে চৌকিতে বসিয়া অথবা খাটিয়ায় শুইয়া আছেন। রতন যখন আহ্বান প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া আছে, তিনি তখন অধীরচিত্তে তাঁহার দরখাস্তের উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন। বালিকা দ্বারের বাহিরে বসিয়া সহস্রবার করিয়া তাহার পুরানো পড়া পড়িল। পাছে যেদিন সহসা ডাক পড়িবে সেদিন তাহার যুক্ত-অক্ষর সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়, এই তাহার একটা আশঙ্কা ছিল। অবশেষে সপ্তাহখানেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ডাক পড়িল। উদ্‌বেলিতহৃদয়ে রতন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, 'দাদাবাবু, আমাকে ডাকছিলে?'

পোস্টমাস্টার বলিলেন, 'রতন, কালই আমি যাচ্ছি।'

রতন। কোথায় যাচ্ছ দাদাবাবু।

পোস্টমাস্টার। বাড়ি যাচ্ছি।

রতন। আবার কবে আসবে।

পোস্টমাস্টার। আর আসব না।

রতন আর-কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পোস্টমাস্টার আপনিই তাহাকে বলিলেন, তিনি বদলির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে; তাই তিনি কাজে জবাব দিয়া বাড়ি যাইতেছেন। অনেকক্ষণ আর কেহ কোনো কথা কহিল না। মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং একস্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপটপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া রান্নাঘরে রুটি গড়িতে গেল। অন্যদিনের মতো তেমন চটপট হইল না। বোধ করি মধ্যে-মধ্যে মাথায় অনেক ভাবনা উদয় হইয়াছিল। পোস্টমাস্টারের আহার সমাপ্ত হইলে পর বালিকা হঠাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?'

Scanned with CamScanner

পোস্টমাস্টার হাসিয়া কহিলেন, 'সে কী করে হবে।' ব্যাপারটা যে কী কী কারণে অসম্ভব তাহা বালিকাকে বুঝানো আবশ্যক বোধ করিলেন না।

সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্টমাস্টারের হাস্যধ্বনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল, 'সে কী করে হবে'।

ভোরে উঠিয়া পোস্টমাস্টার দেখিলেন, তাঁহার স্নানের জল ঠিক আছে; কলিকাতার অভ্যাস অনুসারে তিনি তোলা জলে স্নান করিতেন। কখন তিনি যাত্রা করিবেন সে কথা বালিকা কী কারণে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই ; পাছে প্রাতঃকালে আবশ্যক হয় এইজন্য রতন তত রাত্রে নদী হইতে তাঁহার স্নানের জল তুলিয়া আনিয়াছিল। স্নান সমাপন হইলে রতনের ডাক পড়িল। রতন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল এবং আদেশপ্রতীক্ষায় একবার নীরবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। প্রভু কহিলেন, 'রতন, আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব তিনি তোকে আমারই মতন যত্ন করবেন, আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।' এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে উত্থিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু নারীহৃদয় কে বুঝিবে। রতন অনেকদিন প্রভুর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছ্বসিতহৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, 'না না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই নে।'

পোস্টমাস্টার রতনের এরূপ ব্যবহার কখনো দেখেন নাই, তাই অবাক হইয়া রহিলেন।

নূতন পোস্টমাস্টার আসিল। তাহাকে সমস্ত চার্জ বুঝাইয়া দিয়া পুরাতন পোস্টমাস্টার গমনোন্মুখ হইলেন। যাইবার সময় রতনকে ডাকিয়া বলিলেন, 'রতন, তোকে আমি কখনো কিছু দিতে পারি নি। আজ যাবার সময় তোকে কিছু দিয়ে গেলুম, এতে তোর দিনকয়েক চলবে।'

কিছু পথখরচা বাদে তাঁহার বেতনের যত টাকা পাইয়াছিলেন পকেট হইতে বাহির করিলেন। তখন রতন ধূলায় পড়িয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, 'দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না ; তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না' — বলিয়া একদৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

ভূতপূর্ব পোস্টমাস্টার নিশ্বাস ফেলিয়া, হাতে কার্পেটের ব্যাগ ঝুলাইয়া, কাঁধে ছাতা লইয়া, মুটের মাথায় নীল ও শ্বেত রেখায় চিত্রিত টিনের পেঁটরা তুলিয়া ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে চলিলেন।

যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারি দিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, 'ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি'— কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে— এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।

কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোস্ট-আপিস গৃহের চারি দিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে— সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না। হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়। ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তি শাস্ত্রের বিধান বহুবিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

Scanned with CamScanner

ছুটি

বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট করিয়া একটা নূতন ভাবোদয় হইল; নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল; স্থির হইল, সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে।

যে-ব্যক্তির কাঠ, আবশ্যককালে তাহার যে কতখানি বিস্ময়, বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে, তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল।

কোমর বাঁধিয়া সকলেই যখন মনোযোগের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে ফটিকের কনিষ্ঠ মাখনলাল গম্ভীরভাবে সেই গুঁড়ির উপরে গিয়া বসিল; ছেলেরা তাহার এইরূপ উদার ঔদাসীন্য দেখিয়া কিছু বিমর্ষ হইয়া গেল।

একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে একটু-আধটু ঠেলিল কিন্তু সে তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; এই অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী মানব সকল প্রকার ক্রীড়ার অসারতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।

ফটিক আসিয়া আস্ফালন করিয়া কহিল, 'দেখ, মার খাবি। এইবেলা ওঠ্।'

সে তাহাতে আরো একটু নড়িয়াচড়িয়া আসনটি বেশ স্থায়ীরূপে দখল করিয়া লইল।

এরূপ স্থলে সাধারণের নিকট রাজসম্মান রক্ষা করিতে হইলে অবাধ্য ভ্রাতার গণ্ডদেশে অনতিবিলম্বে এক চড় কষাইয়া দেওয়া ফটিকের কর্তব্য ছিল— সাহস হইল না। কিন্তু এমন একটা ভাব ধারণ করিল, যেন ইচ্ছা করিলেই এখনি উহাকে রীতিমত শাসন করিয়া দিতে পারে কিন্তু করিল না, কারণ পূর্বাপেক্ষা আর-একটা ভালো খেলা মাথায় উদয় হইয়াছে, তাহাতে আর-একটু বেশি মজা আছে। প্রস্তাব করিল, মাখনকে সুদ্ধ ঐ কাঠ গড়াইতে আরম্ভ করা যাক।

মাখন মনে করিল, ইহাতে তাহার গৌরব আছে; কিন্তু অন্যান্য পার্থিব গৌরবের ন্যায় ইহার আনুষঙ্গিক যে বিপদের সম্ভাবনাও আছে, তাহা তাহার কিংবা আর কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

Scanned with CamScanner

ছেলেরা কোমর বাঁধিয়া ঠেলিতে আরম্ভ করিল— 'মারো ঠেলা হেঁইয়ো, সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো।' গুড়ি একপাক ঘুরিতে-না-ঘুরিতেই মাখন তাহার গাম্ভীর্য, গৌরব এবং তত্ত্বজ্ঞানসমেত ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

খেলার আরম্ভেই এইরূপ আশাতীত ফললাভ করিয়া অন্যান্য বালকেরা বিশেষ হৃষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু ফটিক কিছু শশব্যস্ত হইল। মাখন তৎক্ষণাৎ ভূমিশয্যা ছাড়িয়া ফটিকের উপরে গিয়া পড়িল, একেবারে অন্ধভাবে মারিতে লাগিল। তাহার নাকে মুখে আঁচড় কাটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে গমন করিল। খেলা ভাঙিয়া গেল।

ফটিক গোটাকতক কাশ উৎপাটন করিয়া লইয়া একটা অর্ধনিমগ্ন নৌকার গলুইয়ের উপরে চড়িয়া বসিয়া চুপচাপ করিয়া কাশের গোড়া চিবাইতে লাগিল।

এমন সময় একটা বিদেশী নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। একটি অর্ধবয়সী ভদ্রলোক কাঁচা গোঁফ এবং পাকা চুল লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'চক্রবর্তীদের বাড়ি কোথায়।'

বালক ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল, 'ঐ হোথা।' কিন্তু কোন্‌দিকে যে নির্দেশ করিল কাহারও বুঝিবার সাধ্য রহিল না।

ভদ্রলোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথা।'

সে বলিল, 'জানি নে।' বলিয়া পূর্ববৎ তৃণমূল হইতে রসগ্রহণে প্রবৃত্ত হইল। বাবুটি তখন অন্য লোকের সাহায্য অবলম্বন করিয়া চক্রবর্তীদের গৃহের সন্ধানে চলিলেন।

অবিলম্বে বাঘা বাগদি আসিয়া কহিল, 'ফটিকদাদা, মা ডাকছে।'

ফটিক কহিল, 'যাব না।'

বাঘা তাহাকে বলপূর্বক আড়কোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল, ফটিক নিষ্ফল আক্রোশে হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল।

ফটিককে দেখিবামাত্র তাহার মা অগ্নিমূর্তি হইয়া কহিলেন, 'আবার তুই মাখনকে মেরেছিস !'

ফটিক কহিল, 'না, মারি নি।'

'ফের মিথ্যে কথা বলছিস !'

'কখ্‌খনো মারি নি। মাখনকে জিজ্ঞাসা করো।'

মাখনকে প্রশ্ন করাতে মাখন আপনার পূর্ব নালিশ সমর্থন করিয়া বলিল, 'হাঁ, মেরেছে।'

তখন আর ফটিকের সহ্য হইল না। ভ্রুত গিয়া মাখনকে এক সশব্দ চড় কষাইয়া দিয়া কহিল, 'ফের মিথ্যে কথা !'

মা মাখনের পক্ষ লইয়া ফটিককে সবেগে নাড়া দিয়া তাহার পৃষ্ঠে দুটা-তিনটা প্রবল চপেটাঘাত করিলেন। ফটিক মাকে ঠেলিয়া দিল।

মা চীৎকার করিয়া কহিলেন, 'অ্যাঁ, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস !'

এমন সময়ে সেই কাঁচাপাকা বাবুটি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, 'কী হচ্ছে তোমাদের।'

ফটিকের মা বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া কহিলেন, 'ওমা, এ যে দাদা, তুমি কবে এলে।' বলিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিলেন।

বহুদিন হইল দাদা পশ্চিমে কাজ করিতে গিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে ফটিকের মার দুই সন্তান হইয়াছে, তাহারা অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু একবারও দাদার সাক্ষাৎ পায় নাই। আজ বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার ভগিনীকে দেখিতে আসিয়াছেন।

কিছুদিন খুব সমারোহে গেল। অবশেষে বিদায় লইবার দুই-একদিন পূর্বে বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার ভগিনীকে ছেলেদের পড়াশুনা এবং মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে ফটিকের অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খলতা, পাঠে অমনোযোগ, এবং মাখনের সুশান্ত সুশীলতা ও বিদ্যানুরাগের বিবরণ শুনিলেন।

তাঁহার ভগিনী কহিলেন, 'ফটিক আমার হাড় জ্বালাতন করিয়াছে।'

শুনিয়া বিশ্বম্ভর প্রস্তাব করিলেন, তিনি ফটিককে কলিকাতায় লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন। বিধবা এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন।

ফটিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন রে ফটিক, মামার সঙ্গে কলকাতায় যাবি?'

ফটিক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, 'যাব'।

যদিও ফটিককে বিদায় করিতে তাহার মায়ের আপত্তি ছিল না, কারণ তাঁহার মনে সর্বদাই আশঙ্কা ছিল কোন্‌দিন সে মাখনকে জলেই ফেলিয়া দেয় কি মাথাই ফাটায় কি কী একটা দুর্ঘটনা ঘটায়, তথাপি ফটিকের বিদায়গ্রহণের জন্য এতাদৃশ আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন।

'কবে যাবে', 'কখন যাবে' করিয়া ফটিক তাহার মামাকে অস্থির করিয়া তুলিল ; উৎসাহে তাহার রাত্রে নিদ্রা হয় না।

অবশেষে যাত্রাকালে আনন্দের ঔদার্যবশত তাহার ছিপ্ ঘুড়ি লাটাই সমস্ত মাখনকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার পুরা অধিকার দিয়া গেল।

Scanned with CamScanner

কলিকাতায় মামার বাড়ি পৌঁছিয়া প্রথমত মামীর সঙ্গে আলাপ হইল। মামী এই অনাবশ্যক পরিবারবৃদ্ধিতে মনে মনে যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার নিজের তিনটি ছেলে লইয়া তিনি নিজের নিয়মে ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে সহসা একটি তেরো বৎসরের অপরিচিত অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে ছেলে ছাড়িয়া দিলে কিরূপ একটা বিপ্লবের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। বিশ্বম্ভরের এত বয়স হইল, তবু কিছুমাত্র যদি জ্ঞানকাণ্ড আছে।

বিশেষত, তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্‌ভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে ; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়, লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না ; এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোনো সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে, তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ কেহ করিতে সাহস করে না, কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়।

অতএব, এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর-কোনো অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারি দিকের স্নেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মতো বিঁধে। এই বয়সে সাধারণত নারীজাতিকে কোনো-এক শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকের দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাঁহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।

মামীর স্নেহহীন চক্ষে সে যে একটা দুর্গ্রহের মতো প্রতিভাত হইতেছে, এইটে ফটিকের সবচেয়ে বাজিত। মামী যদি দৈবাৎ তাহাকে কোনো-একটা কাজ করিতে বলিতেন, তাহা হইলে সে মনের আনন্দে যতটা আবশ্যক তার চেয়ে বেশি কাজ করিয়া ফেলিত— অবশেষে মামী যখন তাহার উৎসাহ দমন করিয় বলিতেন, 'ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে। ওতে আর তোমায় হাত দিতে হবে না। এখন তুমি নিজের কাজে মন দাও গে। একটু

পড়ো গে যাও।'— তখন তাহার মানসিক উন্নতির প্রতি মামীর এতটা যত্নবাহুল্য তাহার অত্যন্ত নিষ্ঠুর অবিচার বলিয়া মনে হইত।

ঘরের মধ্যে এইরূপ অনাদর, ইহার পর আবার হাঁফ ছাড়িবার জায়গা ছিল না। দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়িয়া কেবলই তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত।

প্রকাণ্ড একটা ধাউস ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, 'তাইরে নাইরে নাইরে না' করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বরচিত রাগিণী আলাপ করিয়া অকর্মণ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন-তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেই-সব দলবল, উপদ্রব, স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত।

জন্তুর মতো একপ্রকার অবুঝ ভালোবাসা— কেবল একটা কাছে যাইবার অন্ধ ইচ্ছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত ব্যাকুলতা, গোধূলিসময়ের মাতৃহীন ব্যাসের মতো কেবল একটা আন্তরিক 'মা মা' ক্রন্দন— সেই লজ্জিত শঙ্কিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলই আলোড়িত হইত।

স্কুলে এতবড়ো নির্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত। মাস্টার যখন মার আরম্ভ করিত তখন ভারক্লান্ত গর্দভের মতো নীরব সহ্য করিত। ছেলেদের যখন খেলিবার ছুটি হইত, তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দূরের বাড়িওলার ছাদ নিরীক্ষণ করিত ; যখন সেই দ্বিপ্রহর-রৌদ্রে কোনো-একটা ছাদে দুটি-একটি ছেলেমেয়ে কিছু-একটা খেলার ছলে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া যাইত, তখন তাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত।

একদিন অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক সাহসে মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'মামা, মার কাছে কবে যাব।' মামা বলিয়াছিলেন, 'স্কুলের ছুটি হোক।' কার্তিক মাসে পূজার ছুটি, সে এখনো ঢের দেরি।

একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। একে তো সহজেই পড়া তৈরি হয় না, তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাস্টার প্রতিদিন তাহাকে অত্যন্ত মারধোর অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে তাহার এমন অবস্থা হইল যে, তাহার মামাতো ভাইরা তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিত। ইহার কোনো অপমানে তাহারা অন্যান্য বালকের চেয়েও যেন বলপূর্বক বেশি করিয়া আমোদ প্রকাশ করিত।

অসহ্য বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক তাহার মামীর কাছে নিতান্ত অপরাধীর মতো গিয়া কহিল, 'বই হারিয়ে ফেলেছি।'

Scanned with CamScanner

মামী অধরের দুই প্রান্তে বিরক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, 'বেশ করেছ, আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারি নে।'

ফটিক আর কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিল— সে যে পরের পয়সা নষ্ট কবিতেছে, এই মনে করিয়া তাহার মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান উপস্থিত হইল ; নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া সেই রাত্রে তাহার মাথাব্যথা করিতে লাগিল এবং গা সিরসির করিয়া আসিল। বুঝিতে পারিল তাহার জ্বর আসিতেছে। বুঝিতে পারিল ব্যামো বাধাইলে তাহার মামীর প্রতি অত্যন্ত অনর্থক উপদ্রব করা হইবে। মামী এই ব্যামোটাকে যে কিরূপ একটা অকারণ অনাবশ্যক জ্বালাতনের স্বরূপ দেখিবে, তাহা সে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিল। রোগের সময় এই অকর্মণ্য অদ্ভুত নির্বোধ বালক পৃথিবীতে নিজের মা ছাড়া আর-কাহারও কাছে সেবা পাইতে পারে, এরূপ প্রত্যাশা করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ফটিককে আর দেখা গেল না। চতুর্দিকে প্রতিবেশীদের ঘরে খোঁজ করিয়া তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেদিন আবার রাত্রি হইতে মুষলধারে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়িতেছে। সুতরাং তাহার খোঁজ করিতে লোকজনকে অনর্থক অনেক ভিজিতে হইল। অবশেষে কোথাও না পাইয়া বিশ্বম্ভরবাবু পুলিসে খবর দিলেন।

সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একটা গাড়ি আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবুর বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। তখনো ঝুপ ঝুপ করিয়া অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে, রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

দুইজন পুলিসের লোক গাড়ি হইতে ফটিককে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া বিশ্বম্ভরবাবুর নিকট উপস্থিত করিল। তাহার আপাদমস্তক ভিজা, সর্বাঙ্গে কাদা, মুখ চক্ষু লোহিতবর্ণ, থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। বিশ্বম্ভরবাবু প্রায় কোলে করিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

মামী তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'কেন বাপু, পরের ছেলেকে নিয়ে কেন এ কর্মভোগ? দাও ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।'

বাস্তবিক, সমস্তদিন দুশ্চিন্তায় তাঁহার ভালোরূপ আহারাদি হয় নাই এবং নিজের ছেলেদের সহিতও নাহক অনেক খিটমিট করিয়াছেন।

ফটিক কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, 'আমি মার কাছে যাচ্ছিলুম, আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।'

বালকের জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি প্রলাপ বকিতে লাগিল। বিশ্বম্ভরবাবু চিকিৎসক লইয়া আসিলেন।

ফটিক তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু একবার উন্মীলিত করিয়া কড়িকাঠের দিকে হতবুদ্ধিভাবে তাকাইয়া কহিল, 'মামা, আমার ছুটি হয়েছে কি।'

বিশ্বম্ভরবাবু রুমালে চোখ মুছিয়া সস্নেহে ফটিকের শীর্ণ তপ্ত হাতখানি হাতের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন।

ফটিক আবার বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল, বলিল, 'মা, আমাকে মারিস্ নে, মা। সত্যি বলছি, আমি কোনো দোষ করি নি।'

পরদিন দিনের বেলা কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হইয়া ফটিক কাহার প্রত্যাশায় ফ্যালফ্যাল করিয়া ঘরের চারি দিকে চাহিল। নিরাশ হইয়া আবার নীরবে দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিশ্বম্ভরবাবু তাহার মনের ভাব বুঝিয়া তাহার কানের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, 'ফটিক, তোর মাকে আনতে পাঠিয়েছি।'

তাহার পরদিনও কাটিয়া গেল। ডাক্তার চিন্তিত বিমর্ষ মুখে জানাইলেন, অবস্থা বড়োই খারাপ।

বিশ্বম্ভরবাবু স্তিমিতপ্রদীপে রোগশয্যায় বসিয়া প্রতিমুহূর্তেই ফটিকের মাতার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ফটিক খালাসিদের মতো সুর করিয়া করিয়া বলিতে লাগিল, 'এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে—এ—এ— না।' কলিকাতায় আসিবার সময় কতকটা রাস্তা স্টীমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসিরা কাছি ফেলিয়া সুর করিয়া জল মাপিত ; ফটিক প্রলাপে তাহাদেরই অনুকরণে করুণস্বরে জল মাপিতেছে এবং যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে, বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।

এমন সময়ে ফটিকের মাতা ঝড়ের মতো ঘরে প্রবেশ করিয়াই উচ্চকলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর বহুকষ্টে তাঁহার শোকোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত করিলে, তিনি শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, 'ফটিক, সোনা, মানিক আমার।'

ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল, 'অ্যাঁ।'

মা আবার ডাকিলেন, 'ওরে ফটিক, বাপধন রে।'

ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, 'মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।'

Scanned with CamScanner

জীবিত ও মৃত

প্রথম পরিচ্ছেদ

রানীহাটের জমিদার শারদাশংকরবাবুদের বাড়ির বিধবা বধূটির পিতৃকুলে কেহ ছিল না ; সকলেই একে একে মারা গিয়াছে। পতিকুলেও ঠিক আপনার বলিতে কেহ নাই, পতিও নাই পুত্রও নাই। একটি ভাসুরপো, শারদাশংকরের ছোটো ছেলেটি, সেই তাহার চক্ষের মণি। সে জন্মিবার পর তাহার মাতার বহুকাল ধরিয়া শক্ত পীড়া হইয়াছিল, সেইজন্য এই বিধবা কাকী কাদম্বিনীই তাহাকে মানুষ করিয়াছে। পরের ছেলে মানুষ করিলে তাহার প্রতি প্রাণের টান আরো যেন বেশি হয়, কারণ তাহার উপরে অধিকার থাকে না ; তাহার উপরে কোনো সামাজিক দাবি নাই, কেবল স্নেহের দাবি— কিন্তু কেবলমাত্র স্নেহ সমাজের সমক্ষে আপনার দাবি কোনো দলিল অনুসারে সপ্রমাণ করিতে পারে না এবং চাহেও না, কেবল অনিশ্চিত প্রাণের ধনটিকে দ্বিগুণ ব্যাকুলতার সহিত ভালোবাসে।

বিধবার সমস্ত রুদ্ধ প্রীতি এই ছোটো ছেলেটির প্রতি সিঞ্চন করিয়া একদিন শ্রাবণের রাত্রে কাদম্বিনীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। হঠাৎ কী কারণে তাহার হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হইয়া গেল— সময় জগতের আর-সর্বত্রই চলিতে লাগিল, কেবল সেই স্নেহকাতর ক্ষুদ্র কোমল বক্ষটির ভিতর সময়ের ঘড়ির কল চিরকালের মতো বন্ধ হইয়া গেল।

পাছে পুলিসের উপদ্রব ঘটে এইজন্য অধিক আড়ম্বর না করিয়া জমিদারের চারি জন ব্রাহ্মণ কর্মচারী অনতিবিলম্বে মৃতদেহ দাহ করিতে লইয়া গেল।

রানীহাটের শ্মশান লোকালয় হইতে বহুদূরে। পুষ্করিণীর ধারে একখানি কুটীর এবং তাহার নিকটে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ, বৃহৎ মাঠে আর-কোথাও কিছু নাই। পূর্বে এইখান দিয়া নদী বহিত, এখন নদী একেবারে শুকাইয়া গেছে। সেই শুষ্ক জলপথের এক অংশ খনন করিয়া শ্মশানের পুষ্করিণী নির্মিত হইয়াছে। এখনকার লোকেরা এই পুষ্করিণীকে পুণ্য স্রোতস্বিনীর প্রতিনিধি-স্বরূপ জ্ঞান করে।

মৃতদেহ কুটীরের মধ্যে স্থাপন করিয়া চিতার কাঠ আসিবার প্রতীক্ষায় চার জনে বসিয়া রহিল। সময় এত দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল যে অধীর হইয়া চারি জনের মধ্যে নিতাই এবং গুরুচরণ কাঠ আনিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন দেখিতে গেল, বিধু এবং বনমালী মৃতদেহ রক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল।

Scanned with CamScanner

শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রি। থমথমে মেঘ করিয়া আছে, আকাশে একটি তারা দেখা যায় না ; অন্ধকার ঘরে দুই জন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একজনের চাদরে দিয়াশলাই এবং বাতি বাঁধা ছিল। বর্ষাকালের দিয়াশলাই বহু চেষ্টাতেও জ্বলিল না— যে লণ্ঠন সঙ্গে ছিল তাহাও নিবিয়া গেছে।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একজন কহিল, 'ভাই রে, এক ছিলিম তামাকের যোগাড় থাকিলে বড়ো সুবিধা হইত। তাড়াতাড়িতে কিছুই আনা হয় নাই।'

অন্য ব্যক্তি কহিল, 'আমি চট করিয়া এক দৌড়ে সমস্ত সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারি।'

বনমালীর পলায়নের অভিপ্রায় বুঝিয়া বিধু কহিল, 'মাইরি। আর, আমি বুঝি এখানে একলা বসিয়া থাকিব।'

আবার কথাবার্তা বন্ধ হইয়া গেল। পাঁচ মিনিটকে এক ঘণ্টা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যাহারা কাঠ আনিতে গিয়াছিল, তাহাদিগকে মনে মনে ইহারা গালি দিতে লাগিল— তাহারা যে দিব্য আরামে কোথাও বসিয়া গল্প করিতে করিতে তামাক খাইতেছে, এ সন্দেহ ক্রমশই তাহাদের মনে ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কোথাও কিছু শব্দ নাই— কেবল পুষ্করিণীতীর হইতে অবিশ্রাম ঝিল্লি এবং ভেকের ডাক শুনা যাইতেছে। এমন সময় মনে হইল যেন খাটটা ঈষৎ নড়িল— যেন মৃতদেহ পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিধু এবং বনমালী রামনাম জপিতে জপিতে কাঁপিতে লাগিল। হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস শুনা গেল। বিধু এবং বনমালী এক মুহূর্তে ঘর হইতে লম্ফ দিয়া বাহির হইয়া গ্রামের অভিমুখে দৌড় দিল।

প্রায় ক্রোশ-দেড়েক পথ গিয়া দেখিল তাহাদের অবশিষ্ট দুই সঙ্গী লণ্ঠন হাতে ফিরিয়া আসিতেছে। তাহারা বাস্তবিকই তামাক খাইতে গিয়াছিল, কাঠের কোনো খবর জানে না, তথাপি সংবাদ দিল গাছ কাটিয়া কাঠ ফাড়াইতেছে— অনতিবিলম্বে রওনা হইবে। তখন বিধু এবং বনমালী কুটীরের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। নিতাই এবং গুরুচরণ অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিল, এবং কর্তব্য ত্যাগ করিয়া আসার জন্য অপর দুই জনের প্রতি অত্যন্ত রাগ করিয়া বিস্তর ভর্ৎসনা করিতে লাগিল।

কালবিলম্ব না করিয়া চার জনেই শ্মশানে সেই কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল মৃতদেহ নাই, শূন্য খাট পড়িয়া আছে।

পরস্পর মুখ চাহিয়া রহিল। যদি শৃগালে লইয়া গিয়া থাকে ? কিন্তু আচ্ছাদনবস্ত্রটি পর্যন্ত নাই। সন্ধান করিতে করিতে বাহিরে গিয়া দেখে কুটীরের দ্বারের কাছে খানিকটা কাদা জমিয়া ছিল, তাহাতে স্ত্রীলোকের সদ্য এবং ক্ষুদ্র পদচিহ্ন।

শারদাশংকর সহজ লোক নহেন, তাঁহাকে এই ভূতের গল্প বলিলে হঠাৎ যে কোনো শুভফল পাওয়া যাইবে এমন সম্ভাবনা নাই। তখন চারজনে বিস্তর পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, দাহকার্য সমাধা হইয়াছে এইরূপ খবর দেওয়াই ভালো।

ভোরের দিকে যাহারা কাঠ লইয়া আসিল, তাহারা সংবাদ পাইল, বিলম্ব দেখিয়া পূর্বেই কার্য শেষ করা হইয়াছে, কুটীরের মধ্যে কাষ্ঠ সঞ্চিত ছিল। এ সম্বন্ধে কাহারও সহজে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না— কারণ, মৃতদেহ এমন-কিছু বহুমূল্য সম্পত্তি নহে যে কেহ ফাঁকি দিয়া চুরি করিয়া লইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সকলেই জানেন, জীবনের যখন কোনো লক্ষণ পাওয়া যায় না তখনো অনেক সময় জীবন প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, এবং সময়মত পুনর্বার মৃতবৎ দেহে তাহার কার্য আরম্ভ হয়। কাদম্বিনীও মরে নাই— হঠাৎ কী কারণে তাহার জীবনের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

যখন সে সচেতন হইয়া উঠিল, দেখিল চতুর্দিকে নিবিড় অন্ধকার। চিরাভ্যাসমত যেখানে শয়ন করিয়া থাকে, মনে হইল, এটা সে জায়গা নহে। একবার ডাকিল 'দিদি'— অন্ধকার ঘরে কেহ সাড়া দিল না। সভয়ে উঠিয়া বসিল, মনে পড়িল সেই মৃত্যুশয্যার কথা। সেই হঠাৎ বক্ষের কাছে একটি বেদনা— শ্বাসরোধের উপক্রম। তাহার বড়ো জা ঘরের কোণে বসিয়া একটি অগ্নিকুণ্ডের উপরে খোকার জন্য দুধ গরম করিতেছে— কাদম্বিনী আর দাঁড়াইতে না পারিয়া বিছানার উপর আছাড় খাইয়া পড়িল— রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, 'দিদি, একবার খোকাকে আনিয়া দাও— আমার প্রাণ কেমন করিতেছে।' তাহার পর সমস্ত কালো হইয়া আসিল— যেন একটি লেখা খাতার উপরে দোয়াতসুদ্ধ কালি গড়াইয়া পড়িল—কাদম্বিনীর সমস্ত স্মৃতি এবং চেতনা, বিশ্বগ্রহের সমস্ত অক্ষর একমুহূর্তে একাকার হইয়া গেল। খোকা তাহাকে একবার শেষবারের মতো তাহার সেই সুমিষ্ট ভালোবাসার স্বরে কাকিমা বলিয়া ডাকিয়াছিল কি না, তাহার অনন্ত অজ্ঞাত মরণ যাত্রার পথে চিরপরিচিত পৃথিবী হইতে এই শেষ স্নেহপাথেয়টুকু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল কি না বিধবার তাহাও মনে পড়ে না।

প্রথমে মনে হইল, যমালয় বুঝি এইরূপ চিরনির্জন এবং চিরান্ধকার। সেখানে কিছুই দেখিবার নাই, শুনিবার নাই, কাজ করিবার নাই, কেবল চিরকাল এইরূপ উঠিয়া জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।

Scanned with CamScanner

তাহার পর যখন মুক্তদ্বার দিয়া হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা বাদলার বাতাস দিল এবং বর্ষার ভেকের ডাক কানে প্রবেশ করিল, তখন এক মুহূর্তে তাহার এই স্বল্প জীবনের আশৈশব সমস্ত বর্ষার স্মৃতি ঘনীভূতভাবে তাহার মনে উদয় হইল এবং পৃথিবীর নিকটসংস্পর্শ সে অনুভব করিতে পারিল। একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল ; সম্মুখে পুষ্করিণী, বটগাছ, বৃহৎ মাঠ এবং সুদূর তরুশ্রেণী এক পলকে চোখে পড়িল। মনে পড়িল, মাঝে মাঝে পুণ্য তিথি উপলক্ষে এই পুষ্করিণীতে আসিয়া স্নান করিয়াছে, এবং মনে পড়িল সেই সময়ে এই শ্মশানে মৃতদেহ দেখিয়া মৃত্যুকে কী ভয়ানক মনে হইত।

প্রথমে মনে হইল, বাড়ি ফিরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু তখনি ভাবিল, আমি তো বাঁচিয়া নাই, আমাকে বাড়িতে লইবে কেন। সেখানে যে অমঙ্গল হইবে। জীবরাজ্য হইতে আমি যে নির্বাসিত হইয়া আসিয়াছি— আমি যে আমার প্রেতাত্মা।

তাই যদি না হইবে তবে সে এই অর্ধরাত্রে শারদাশংকরের সুরক্ষিত অন্তঃপুর হইতে এই দুর্গম শ্মশানে আসিল কেমন করিয়া। এখনো যদি তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ না হইয়া থাকে তবে দাহ করিবার লোকজন গেল কোথায় ? শারদাশংকরের আলোকিত গৃহে তাহার মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত মনে পড়িল, তাহার পরেই এই বহুদূরবর্তী জনশূন্য অন্ধকার শ্মশানের মধ্যে আপনাকে একাকিনী দেখিয়া সে জানিল, আমি এই পৃথিবীর জনসমাজের আর কেহ নহি— আমি অতি ভীষণ, অকল্যাণকারিণী ; আমি আমার প্রেতাত্মা।

এই কথা মনে উদয় হইবামাত্রই তাহার মনে হইল, তাহার চতুর্দিক হইতে বিশ্বনিয়মের সমস্ত বন্ধন যেন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। যেন তাহার অদ্ভুত শক্তি, অসীম স্বাধীনতা— যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে, যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। এই অভূতপূর্ব নূতন ভাবের আর্বিভাবে সে উন্মত্তের মতো হইয়া হঠাৎ একটা দমকা বাতাসের মতো ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্ধকার শ্মশানের উপর দিয়া চলিল— মনে লজ্জা ভয় ভাবনার লেশমাত্র রহিল না।

চলিতে চলিতে চরণ শ্রান্ত, দেহ দুর্বল হইয়া আসিতে লাগিল। মাঠের পর মাঠ আর শেষ হয় না— মাঝে মাঝে ধান্যক্ষেত্র— কোথাও বা একহাঁটু জল দাঁড়াইয়া আছে। যখন ভোরের আলো অল্প অল্প দেখা দিয়াছে তখন অদূরে লোকালয়ের বাঁশঝাড় হইতে দুটো-একটা পাখির ডাক শুনা গেল।

তখন তাহার কেমন ভয় করিতে লাগিল। পৃথিবীর সহিত জীবিত মনুষ্যের সহিত এখন তাহার কিরূপ নূতন সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে, সে কিছুই জানে না। যতক্ষণ মাঠে ছিল, শ্মশানে ছিল, শ্রাবণরজনীর অন্ধকারের মধ্যে ছিল ততক্ষণ সে যেন নির্ভয়ে ছিল, যেন আপন রাজ্যে ছিল। দিনের আলোকে লোকালয় তাহার পক্ষে অতি ভয়ংকর স্থান বলিয়া বোধ হইল। মানুষ ভূতকে ভয় করে, ভূতও মানুষকে ভয় করে, মৃত্যুনদীর দুই পারে দুই জনের বাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাপড়ে কাদা মাখিয়া, অদ্ভুত ভাবের বশে ও রাত্রিজাগরণে পাগলের মতো হইয়া কাদম্বিনীর যেরূপ চেহারা হইয়াছিল তাহাতে মানুষ তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইতে পারিত এবং ছেলেরা বোধ হয় দূরে পালাইয়া গিয়া তাহাকে ঢেলা মারিত। সৌভাগ্যক্রমে একটি পথিক ভদ্রলোক তাহাকে সর্বপ্রথমে এই অবস্থায় দেখিতে পায়।

সে আসিয়া কহিল, 'মা, তোমাকে ভদ্রকুলবধূ বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি এ অবস্থায় একলা পথে কোথায় চলিয়াছ।'

কাদম্বিনী প্রথমে কোনো উত্তর না দিয়া তাকাইয়া রহিল। হঠাৎ কিছুই ভাবিয়া পাইল না। সে যে সংসারের মধ্যে আছে তাহাকে যে ভদ্রকুলবধূর মতো দেখাইতেছে, গ্রামের পথে পথিক তাহাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে, এ-সমস্তই তাহার কাছে অভাবনীয় বলিয়া বোধ হইল।

পথিক তাহাকে পুনশ্চ কহিল, 'চলো মা, আমি তোমাকে ঘরে পৌঁছাইয়া দিই— তোমার বাড়ি কোথায় আমাকে বলো।'

কাদম্বিনী চিন্তা করিতে লাগিল। শ্বশুরবাড়ি ফিরিবার কথা মনে স্থান দেওয়া যায় না, বাপের বাড়ি তো নাই— তখন ছেলেবেলার সইকে মনে পড়িল।

সই যোগমায়ার সহিত যদিও ছেলেবেলা হইতেই বিচ্ছেদ তথাপি মাঝে মাঝে চিঠিপত্র চলে। এক-এক সময় রীতিমত ভালোবাসার লড়াই চলিতে থাকে— কাদম্বিনী জানাইতে চাহে ভালোবাসা তাহার দিকেই প্রবল, যোগমায়া জানাইতে চাহে কাদম্বিনী তাহার ভালোবাসার যথোপযুক্ত প্রতিদান দেয় না। কোনো সুযোগে একবার উভয়ে মিলন হইতে পারিলে যে একদণ্ড কেহ কাহাকে চোখের আড়াল করিতে পারিবে না, এ বিষয়ে কোনো পক্ষেরই কোনো সন্দেহ ছিল না।

কাদম্বিনী ভদ্রলোকটিকে কহিল, 'নিশিন্দাপুরে শ্রীপতিচরণবাবুর বাড়ি যাইব।'

পথিক কলিকাতায় যাইতেছিলেন, নিশিন্দাপুর যদিও নিকটবর্তী নহে তথাপি তাঁহার গম্য পথেই পড়ে। তিনি স্বয়ং বন্দোবস্ত করিয়া কাদম্বিনীকে শ্রীপতিচরণবাবুর বাড়ি পৌঁছাইয়া দিলেন।

দুই সইয়ে মিলন হইল। প্রথম চিনিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল, তার পরে বাল্যসাদৃশ্য উভয়ের চক্ষে ক্রমশই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

যোগমায়া কহিল, 'ওমা আমার কি ভাগ্য। তোমার যে দর্শন পাইব এমন তো

Scanned with CamScanner

আমার মনেই ছিল না। কিন্তু ভাই, তুমি কী করিয়া আসিলে। তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যে তোমাকে ছাড়িয়া দিল!'

কাদম্বিনী চুপ করিয়া রহিল, অবশেষে কহিল, 'ভাই শ্বশুরবাড়ির কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো না। আমাকে দাসীর মতো বাড়ির একপ্রান্তে স্থান দিয়ো, আমি তোমাদের কাজ করিয়া দিব।'

যোগমায়া কহিল, 'ওমা, সে কী কথা। দাসীর মতো থাকিবে কেন। তুমি আমার সই, তুমি আমার'— ইত্যাদি।

এমন সময় শ্রীপতি ঘরে প্রবেশ করিল। কাদম্বিনী খানিকক্ষণ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল— মাথায় কাপড় দেওয়া বা কোনোরূপ সংকোচ বা সম্ভ্রমের লক্ষণ দেখা গেল না।

পাছে তাহার সইয়ের বিরুদ্ধে শ্রীপতি কিছু মনে করে, এজন্য ব্যস্ত হইয়া যোগমায়া নানারূপে তাহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু এতই অল্প বুঝাইতে হইল এবং শ্রীপতি এত সহজে যোগমায়ার সমস্ত প্রস্তাবে অনুমোদন করিল যে, যোগমায়া মনে মনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইল না।

কাদম্বিনী সইয়ের বাড়িতে আসিল, কিন্তু সইয়ের সঙ্গে মিশিতে পারিল না— মাঝে মৃত্যুর ব্যবধান। আত্মসম্বন্ধে সর্বদা একটা সন্দেহ এবং চেতনা থাকিলে পরের সঙ্গে মেলা যায় না। কাদম্বিনী যোগমায়ার মুখের দিকে চায় এবং কী যেন ভাবে— মনে করে, স্বামী এবং ঘরকন্না লইয়া ও যেন বহুদূরে আর-এক জগতে আছে। স্নেহ মমতা এবং সমস্ত কর্তব্য লইয়া ও যেন পৃথিবীর লোক, আর আমি যেন শূন্য ছায়া। ও যেন অস্তিত্বের দেশে আর আমি যেন অনন্তের মধ্যে।

যোগমায়ারও কেমন কেমন লাগিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। স্ত্রীলোক রহস্য সহ্য করিতে পারে না— কারণ অনিশ্চিতকে লইয়া কবিত্ব করা যায়, বীরত্ব করা যায়, পাণ্ডিত্য করা যায়, কিন্তু ঘরকন্না করা যায় না। এইজন্য স্ত্রীলোক যেটা বুঝিতে পারে না, হয় সেটার অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া তাহার সহিত কোনো সম্পর্ক রাখে না, নয় তাহাকে স্বহস্তে নূতন মূর্তি দিয়া নিজের ব্যবহারযোগ্য একটি সামগ্রী গড়িয়া তোলে— যদি দুইয়ের কোনোটাই না পারে তবে তাহার উপর ভারি রাগ করিতে থাকে।

কাদম্বিনী যতই দুর্বোধ হইয়া উঠিল, যোগমায়া তাহার উপর ততই রাগ করিতে লাগিল, ভাবিল, এ কী উপদ্রব স্কন্ধের উপর চাপিল।

আবার আর-এক বিপদ। কাদম্বিনীর আপনাকে আপনি ভয় করে। সে নিজের

কাছ হইতে নিজে কিছুতেই পলাইতে পারে না। যাহাদের ভূতের ভয় আছে তাহারা আপনার পশ্চাদ্দিককে ভয় করে— যেখানে দৃষ্টি রাখিতে পারে না সেইখানেই ভয়। কিন্তু, কাদম্বিনীর আপনার মধ্যেই সর্বাপেক্ষা বেশি ভয়— বাহিরে তার ভয় নাই।

এইজন্য বিজন দ্বিপ্রহরে সে একা ঘরে এক-এক দিন চীৎকার করিয়া উঠিত— এবং সন্ধ্যাবেলায় দীপালোকে আপনার ছায়া দেখিলে তাহার গা ছমছম করিতে থাকিত।

তাহার এই ভয় দেখিয়া বাড়িসুদ্ধ লোকের মনে কেমন একটা ভয় জন্মিয়া গেল। চাকরদাসীরা এবং যোগমায়াও যখন-তখন যেখানে-সেখানে ভূত দেখিতে আরম্ভ করিল।

একদিন এমন হইল, কাদম্বিনী অর্ধরাত্রে আপন শয়নগৃহ হইতে কাঁদিয়া বাহির হইয়া একেবারে যোগমায়ার গৃহদ্বারে আসিয়া কহিল, 'দিদি, দিদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি গো! আমায় একলা ফেলিয়া রাখিয়ো না।'

যোগমায়ার যেমন ভয়ও পাইল তেমনি রাগও হইল। ইচ্ছা করিল তদ্দণ্ডেই কাদম্বিনীকে দূর করিয়া দেয়। দয়াপরবশ শ্রীপতি অনেক চেষ্টায় তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া পার্শ্ববর্তী গৃহে স্থান দিল।

পরদিন অসময়ে অন্তঃপুরে শ্রীপতির তলব হইল। যোগমায়া তাহাকে অকস্মাৎ ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিল, 'হাঁ গা, তুমি কেমনধারা লোক! একজন মেয়েমানুষ আপন শ্বশুরঘর ছাড়িয়া তোমার ঘরে আসিয়া অধিষ্ঠান হইল, মাসখানেক হইয়া গেল তবু যাইবার নাম করে না, আর তোমার মুখে যে একটি আপত্তিমাত্র শুনি না! তোমার মনের ভাবটা কী বুঝাইয়া বলো দেখি। তোমরা পুরুষমানুষ এমনি জাতই বটে।'

বাস্তবিক সাধারণ স্ত্রীজাতির 'পরে পুরুষমানুষের একটা নির্বিচার পক্ষপাত আছে এবং সেজন্য স্ত্রীলোকেরাই তাহাদিগকে অধিক অপরাধী করে। নিঃসহায় অথচ সুন্দরী কাদম্বিনীর প্রতি শ্রীপতির করুণা যে যথোচিত মাত্রার চেয়ে কিঞ্চিৎ অধিক ছিল তাহার বিরুদ্ধে তিনি যোগমায়ার গাত্রস্পর্শপূর্বক শপথ করিতে উদ্যত হইলেও তাঁহার ব্যবহারে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইত।

তিনি মনে করিতেন, 'নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এই পুত্রহীনা বিধবার প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিত, তাই নিতান্ত সহ্য করিতে না পারিয়া পালাইয়া কাদম্বিনী আমার আশ্রয় লইয়াছে। যখন ইহার বাপ মা কেহই নাই, তখন আমি ইহাকে কী করিয়া ত্যাগ করি।' এই বলিয়া তিনি কোনোরূপ সন্ধান লইতে ক্ষান্ত ছিলেন এবং কাদম্বিনীকেও এই অপ্রীতিকর বিষয় প্রশ্ন করিয়া ব্যথিত করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না।

তখন তাঁহার স্ত্রী তাঁহার অসাড় কর্তব্যবুদ্ধিতে নানাপ্রকার আঘাত দিতে লাগিল।

Scanned with CamScanner

কাদম্বিনীর শ্বশুরবাড়িতে খবর দেওয়া যে তাঁহার গৃহের শান্তিরক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন, হঠাৎ চিঠি লিখিয়া বসিলে ভালো ফল নাও হইতে পারে অতএব রানীহাটে তিনি নিজে গিয়া সন্ধান লইয়া যাহা কর্তব্য স্থির করিবেন।

শ্রীপতি তো গেলেন, এদিকে যোগমায়া কাদম্বিনীকে কহিল, 'সই, এখানে তোমার আর থাকা ভালো দেখাইতেছে না। লোকে বলিবে কী।'

কাদম্বিনী গম্ভীরভাবে যোগমায়ার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, 'লোকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী।'

যোগমায়া কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। কিঞ্চিৎ রাগিয়া কহিল, 'তোমার না থাকে, আমাদের তো আছে। আমরা পরের ঘরের বধূকে কী বলিয়া আটক করিয়া রাখিব।'

কাদম্বিনী কহিল, 'আমার শ্বশুরঘর কোথায়।'

যোগমায়া ভাবিল, আ-মরণ ! পোড়াকপালী বলে কী।

কাদম্বিনী ধীরে ধীরে কহিল, 'আমি কি তোমাদের কেহ। আমি কি এ পৃথিবীর। তোমরা হাসিতেছ, কাঁদিতেছ, ভালোবাসিতেছ, সবাই আপন আপন লইয়া আছ, আমি তো কেবল চাহিয়া আছি। তোমরা মানুষ, আর আমি ছায়া। বুঝিতে পারি না, ভগবান আমাকে তোমাদের এই সংসারের মাঝখানে কেন রাখিয়াছেন। তোমরাও ভয় কর পাছে তোমাদের হাসিখেলার মধ্যে আমি অমঙ্গল আনি— আমিও বুঝিয়া উঠিতে পারি না, তোমাদের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক। কিন্তু ঈশ্বর যখন আমাদের জন্য আর-কোনো স্থান গড়িয়া রাখেন নাই, তখন কাজে কাজেই বন্ধন ছিঁড়িয়া যায় তবু তোমাদের কাছেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াই।'

এমনি ভাবে চাহিয়া কথাগুলা বলিয়া গেল যে, যোগমায়া কেমন এক রকম করিয়া মোটের উপর একটা কী বুঝিতে পারিল কিন্তু আসল কথাটা বুঝিল না, জবাবও দিতে পারিল না। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিতেও পারিল না। অত্যন্ত ভারগ্রস্ত গম্ভীর ভাবে চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রায় যখন দশটা তখন শ্রীপতি রানীহাট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। মুষলধারে বৃষ্টিতে পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। ক্রমাগতই তাহার ঝর ঝর শব্দে মনে হইতেছে, বৃষ্টির শেষ নাই, আজ রাত্রিরও শেষ নাই।

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী হইল।'

শ্রীপতি কহিলেন, 'সে অনেক কথা। পরে হইবে।' বলিয়া কাপড় ছাড়িয়া আহার করিলেন এবং তামাক খাইয়া শুইতে গেলেন। ভাবটা অত্যন্ত চিন্তিত।

যোগমায়া অনেকক্ষণ কৌতূহল দমন করিয়া ছিলেন, শয্যায় প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী শুনিলে, বলো।'

শ্রীপতি কহিলেন, 'নিশ্চয় তুমি একটা ভুল করিয়াছ।'

শুনিবামাত্র যোগমায়া মনে মনে ঈষৎ রাগ করিলেন। ভুল মেয়েরা কখনোই করে না, যদি বা করে কোনো সুবুদ্ধি পুরুষের সেটা উল্লেখ করা কর্তব্য হয় না, নিজের ঘাড় পাতিয়া লওয়াই সুযুক্তি। যোগমায়া কিঞ্চিৎ উষ্মভাবে কহিলেন, 'কিরকম শুনি।'

শ্রীপতি কহিলেন, 'যে স্ত্রীলোকটিকে তোমার ঘরে স্থান দিয়াছ সে তোমার সই কাদম্বিনী নহে।'

এমনতরো কথা শুনিলে সহজেই রাগ হইতে পারে— বিশেষত নিজের স্বামীর মুখে শুনিলে তো কথাই নাই। যোগমায়া কহিলেন, 'আমার সইকে আমি চিনি না, তোমার কাছ হইতে চিনিয়া লইতে হইবে— কী কথার শ্রী।'

শ্রীপতি বুঝাইলেন এ স্থলে কথার শ্রী লইয়া কোনোরূপ তর্ক হইতেছে না, প্রমাণ দেখিতে হইবে। যোগমায়ার সই কাদম্বিনী যে মারা গিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

যোগমায়া কহিলেন, 'ঐ শোনো। তুমি নিশ্চয় একটা গোল পাকাইয়া আসিয়াছ। কোথায় যাইতে কোথায় গিয়াছ, কী শুনিতে কী শুনিয়াছ তাহার ঠিক নাই। তোমাকে নিজে যাইতে কে বলিল, একখানা চিঠি লিখিয়া দিলেই সমস্ত পরিষ্কার হইত।'

নিজের কর্মপটুতার প্রতি স্ত্রীর এইরূপ বিশ্বাসের অভাবে শ্রীপতি অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হইয়া বিস্তারিতভাবে সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন— কিন্তু কোনো ফল হইল না। উভয়পক্ষে হাঁ-না করিতে করিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া গেল।

যদিও কাদম্বিনীকে এই দণ্ডেই গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে স্বামী স্ত্রী কাহারও মতভেদ ছিল না। কারণ শ্রীপতির বিশ্বাস, তাঁহার অতিথি ছদ্মপরিচয়ে তাঁহার স্ত্রীকে এতদিন প্রতারণা করিয়াছে এবং যোগমায়ার বিশ্বাস সে কুলত্যাগিনী— তথাপি উপস্থিত তর্কটা সম্বন্ধে উভয়ের কেহই হার মানিতে চাহেন না।

উভয়ের কণ্ঠস্বর ক্রমেই উচ্চ হইয়া উঠিতে লাগিল, ভুলিয়া গেলেন পাশের ঘরেই কাদম্বিনী শুইয়া আছে।

Scanned with CamScanner

একজন বলেন, 'ভালো বিপদেই পড়া গেল। আমি নিজের কানে শুনিয়া আসিলাম।'

আর-একজন দৃঢ়স্বরে বলেন, 'সে কথা বলিলে মানিব কেন, আমি নিজের চক্ষে দেখিতেছি।'

অবশেষে যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, কাদম্বিনী কবে মরিল বলো দেখি।'

ভাবিলেন কাদম্বিনীর কোনো-একটা চিঠির তারিখের সহিত অনৈক্য বাহির করিয়া শ্রীপতির ভ্রম সপ্রমাণ করিয়া দিবেন।

শ্রীপতি যে তারিখের কথা বলিলেন, উভয়ে হিসাব করিয়া দেখিলেন যেদিন সন্ধ্যাবেলায় কাদম্বিনী তাঁহাদের বাড়িতে আসে সে তারিখ ঠিক তাহার পূর্বের দিনেই পড়ে। শুনিবামাত্র যোগমায়ার বুকটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল, শ্রীপতিরও কেমন এক রকম বোধ হইতে লাগিল।

এমন সময়ে তাঁহাদের ঘরের দ্বার খুলিয়া গেল, একটা বাদলার বাতাস আসিয়া প্রদীপটা ফস করিয়া নিবিয়া গেল। বাহিরের অন্ধকার প্রবেশ করিয়া একমুহূর্তে সমস্ত ঘরটা আগাগোড়া ভরিয়া গেল। কাদম্বিনী একেবারে ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন রাত্রি আড়াই প্রহর হইয়া গিয়াছে, বাহিরে অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে।

কাদম্বিনী কহিল, 'সই, আমি তোমার সেই কাদম্বিনী, কিন্তু এখন আমি আর বাঁচিয়া নাই। আমি মারিয়া আছি।'

যোগমায়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন— শ্রীপতির বাকস্ফূর্তি হইল না।

'কিন্তু আমি মরিয়াছি ছাড়া তোমাদের কাছে আর কী অপরাধ করিয়াছি। আমার যদি ইহলোকেও স্থান নাই পরলোকেও স্থান নাই— ওগো তবে কোথায় যাইব।' তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া যেন এই গভীর বর্ষানিশীথে সুপ্ত বিধাতাকে জাগ্রত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল— 'ওগো , আমি তবে কোথায় যাইব।'

এই বলিয়া মূর্ছিত দম্পতিকে অন্ধকার ঘরে ফেলিয়া বিশ্বজগতে কাদম্বিনী আপনার স্থান খুঁজিতে গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কাদম্বিনী যে কেমন করিয়া রানীহাটে ফিরিয়া গেল, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু প্রথমে কাহাকেও দেখা দিল না। সমস্ত দিন অনাহারে একটা ভাঙা পোড়ো মন্দিরে যাপন করিল।

বর্ষার অকাল সন্ধ্যা যখন অত্যন্ত ঘন হইয়া আসিল এবং আসন্ন দুর্যোগের আশঙ্কায় গ্রামের লোকেরা ব্যস্ত হইয়া আপন আপন গৃহ আশ্রয় করিল তখন কাদম্বিনী পথে বাহির হইল। শ্বশুরবাড়ির দ্বারে গিয়া একবার তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু মস্ত

ঘোমটা টানিয়া যখন ভিতরে প্রবেশ করিল দাসীশ্রমে দ্বারীরা কোনোরূপ বাধা দিল না— এমন সময় বৃষ্টি খুব চাপিয়া আসিল, বাতাসও বেগে বহিতে লাগিল।

তখন বাড়ির গৃহিনী শারদাশংকরের স্ত্রী তাঁহার বিধবা ননদের সহিত তাস খেলিতেছিলেন। ঝি ছিল রান্নাঘরে এবং পীড়িত খোকা জ্বরের উপশমে শয়নগৃহে বিছানায় ঘুমাইতেছিল। কাদম্বিনী সকলের চক্ষু এড়াইয়া সেই ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। সে যে কী ভাবিয়া শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছিল জানি না, সে নিজেও জানে না, কেবল এইটুকু জানে যে একবার খোকাকে চক্ষে দেখিয়া যাইবার ইচ্ছা। তাহার পর কোথায় যাইবে, কী হইবে, সে কথা সে ভাবেও নাই।

দীপালোকে দেখিল রুগ্‌ণ শীর্ণ খোকা হাত মুঠা করিয়া ঘুমাইয়া আছে। দেখিয়া উত্তপ্ত হৃদয় যেন তৃষাতুর হইয়া উঠিল— তাহার সমস্ত বালাই লইয়া তাহাকে একবার বুকে চাপিয়া না ধরিলে কি বাঁচা যায়। আর, তাহার পর মনে পড়িল, 'আমি নাই, ইহাকে দেখিবার কে আছে। ইহার মা সঙ্গ ভালোবাসে, গল্প ভালোবাসে, খেলা ভালোবাসে, এতদিন আমার হাতে ভার দিয়াই সে নিশ্চিন্ত ছিল, কখনো তাহাকে ছেলে মানুষ করিবার কোনো দায় পোহাইতে হয় নাই। আজ ইহাকে কে তেমন করিয়া যত্ন করিবে।'

এমন সময় খোকা হঠাৎ পাশ ফিরিয়া অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় বলিয়া উঠিল, 'কাকিমা জল দে।' আ মরিয়া যাই ! সোনা আমার, তোর কাকিমাকে এখনো ভুলিস নাই ! তাড়াতাড়ি কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া লইয়া খোকাকে বুকের উপর তুলিয়া কাদম্বিনী তাকে জলপান করাইল।

যতক্ষণ ঘুমের ঘোর ছিল, চিরাভ্যাসমত কাকিমার হাত হইতে জল খাইতে খোকার কিছুই আশ্চর্যবোধ হইল না। অবশেষে কাদম্বিনী যখন বহুকালের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে আবার শুয়াইয়া দিল, তখন তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল এবং কাকিমাকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কাকিমা, তুই মরে গিয়েছিলি?'

কাকিমা কহিল, 'হাঁ খোকা।'

'আবার তুই খোকার কাছে ফিরে এসেছিস? আর তুই মরে যাবি নে?'

ইহার উত্তর দিবার পূর্বেই একটা গোল বাধিল— ঝি একবাটি সাগু হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, হঠাৎ বাটি ফেলিয়া 'মাগো' বলিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল।

চীৎকার শুনিয়া তাস ফেলিয়া গিন্নি ছুটিয়া আসিলেন, ঘরে ঢুকিতেই তিনি একেবারে কাঠের মতো হইয়া গেলেন, পালাইতেও পারিলেন না, মুখ দিয়া একটি কথাও সরিল না।

এই-সকল ব্যাপার দেখিয়া খোকারও মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়া উঠিল— সে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল, 'কাকিমা, তুই যা।'

Scanned with CamScanner

কাদম্বিনী অনেকদিন পরে আজ অনুভব করিয়াছে যে সে মরে নাই— সেই পুরাতন ঘরদ্বার, সেই সমস্ত, সেই খোকা, সেই স্নেহ, তাহার পক্ষে সমান জীবন্তভাবেই আছে, মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ কোনো ব্যবধান জন্মায় নাই। সইয়ের বাড়ি গিয়া অনুভব করিয়াছিল বাল্যকালের সে সই মরিয়া গিয়াছে— খোকার ঘরে আসিয়া বুঝিতে পারিল, খোকার কাকিমা তো একদিনও মরে নাই।

ব্যাকুলভাবে কহিল, 'দিদি, তোমরা আমাকে দেখিয়া কেন ভয় পাইতেছ। এই দেখো, আমি তোমাদের সেই তেমনি আছি।'

গিন্নি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

ভগ্নীর কাছে সংবাদ পাইয়া শারদাশংকরবাবু স্বয়ং অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন— তিনি জোড়হস্তে কাদম্বিনীকে কহিলেন, 'ছোটোবউমা, এই কি তোমার উচিত হয়। সতীশ আমার বংশের একমাত্র ছেলে, উহার প্রতি তুমি কেন দৃষ্টি দিতেছ। আমরা কি তোমার পর। তুমি যাওয়ার পর হইতে ও প্রতিদিন শুকাইয়া যাইতেছে, উঁহার ব্যামো আর ছাড়ে না, দিনরাত কেবল 'কাকিমা কাকিমা' করে। যখন সংসার হইতে বিদায় লইয়াছ তখন এ মায়াবন্ধন ছিঁড়িয়া যাও— আমরা তোমার যথোচিত সৎকার করিব।'

তখন কাদম্বিনী আর সহিতে পারিল না, তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'ওগো, আমি মরি নাই গো, মরি নাই। আমি কেমন করিয়া তোমাদের বুঝাইব, আমি মরি নাই। এই দেখো, আমি বাঁচিয়া আছি।'

বলিয়া কাঁসার বাটিটা ভূমি হইতে তুলিয়া কপালে আঘাত করিতে লাগিল, কপাল ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল।

তখন বলিল, 'এই দেখো, আমি বাঁচিয়া আছি।'

শারদাশংকর মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন— খোকা ভয়ে বাবাকে ডাকিতে লাগিল, দুই মূর্ছিতা রমণী মাটিতে পড়িয়া রহিল।

তখন কাদম্বিনী 'ওগো, আমি মরি নাই গো, মরি নাই গো, মরি নাই'— বলিয়া চীৎকার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর জলের মধ্যে গিয়া পড়িল। শারদাশংকর উপরের ঘর হইতে শুনিতে পাইলেন ঝপাস করিয়া একটা শব্দ হইল।

সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তাহার পরদিন সকালেও বৃষ্টি পড়িতেছে— মধ্যাহ্নেও বৃষ্টির বিরাম নাই। কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।

Scanned with CamScanner

বলাই

মানুষের জীবনটা পৃথিবীর নানা জীবের ইতিহাসের নানা পরিচ্ছেদের উপসংহারে, এমন একটা কথা আছে। লোকালয়ে মানুষের মধ্যে আমরা নানা জীবজন্তুর প্রচ্ছন্ন পরিচয় পেয়ে থাকি, সে কথা জানা। বস্তুত আমরা মানুষ বলি সেই পদার্থকে যেটা আমাদের ভিতরকার সব জীবজন্তুকে মিলিয়ে এক করে নিয়েছে— আমাদের বাঘ-গোরুকে এক খোঁয়াড়ে দিয়েছে পুরে, অহি-নকুলকে এক খাঁচায় ধরে রেখেছে। যেমন রাগিণী বলি তাকেই যা আপনার ভিতরকার সমুদয় সা-রে-গা-মা-গুলোকে সংগীত করে তোলে, তারপর থেকে তাদের আর গোলমাল করবার সাধ্য থাকে না। কিন্তু, সংগীতের ভিতরে এক-একটি সুর অন্য-সকল সুরকে ছাড়িয়ে বিশেষ হয়ে ওঠে— কোনোটাতে মধ্যম, কোনোটাতে কোমলগান্ধার, কোনোটাতে পঞ্চম।

আমার ভাইপো বলাই— তার প্রকৃতিতে কেমন করে গাছপালার মূল সুরগুলোই হয়েছে প্রবল। ছেলেবেলা থেকেই চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখাই তার অভ্যাস, নড়ে-চড়ে বেড়ানো নয়। পুবদিকের আকাশে কালো মেঘ স্তরে স্তরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায়, ওর সমস্ত মনটাতে ভিজে হাওয়া যেন শ্রাবণ-অরণ্যের গন্ধ নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে ; ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ে, ওর সমস্ত গা যেন শুনতে পায় সেই বৃষ্টির শব্দ। ছাদের উপর বিকেলবেলাকার রোদ্দুর পড়ে আসে, গা খুলে বেড়ায় ; সমস্ত আকাশ থেকে যেন কী একটা সংগ্রহ করে নেয়। মাঘের শেষে আমের বোল ধরে, তার একটা নিবিড় আনন্দ জেগে ওঠে ওর রক্তের মধ্যে, একটা কিসের অব্যক্ত স্মৃতিতে ; ফাল্গুনে পুষ্পিত শালবনের মতোই ওর অন্তর-প্রকৃতিটা চার দিকে বিস্তৃত হয়ে ওঠে, ভরে ওঠে, তাতে একটা ঘন রঙ লাগে। তখন ওর একলা ব'সে ব'সে আপন মনে কথা কইতে ইচ্ছে করে, যা-কিছু গল্প শুনেছে সব নিয়ে জোড়াতাড়া দিয়ে। অতি পুরানো বটের কোটরে বাসা বেঁধে আছে যে একজোড়া অতি পুরানো পাখি, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, তাদের গল্প। ঐ ড্যাবা-ড্যাবা-চোখ-মেলে-সর্বদাতাকিয়ে-থাকা ছেলেটা বেশি কথা কইতে পারে না। তাই ওকে মনে মনে অনেক বেশি ভাবতে হয়। ওকে একবার পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলুম। আমাদের বাড়ির সামনে ঘন সবুজ ঘাস পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে পর্যন্ত নেবে গিয়েছে, সেইটে দেখে আর ওর মন ভারি খুশি হয়ে ওঠে। ঘাসের আস্তরণটা একটা স্থির পদার্থ তা ওর মনে হয় না ; ওর বোধ হয়, যেন ঐ ঘাসের পুঞ্জ একটা গড়িয়ে-চলা খেলা, কেবলই গড়াচ্ছে ; প্রায়ই তারই সেই ঢালু বেয়ে

Scanned with CamScanner

ও নিজেও গড়াত— সমস্ত দেহ দিয়ে ঘাস হয়ে উঠত— গড়াতে গড়াতে ঘাসের আগায় ওর ঘাড়ের কাছে সুড়সুড়ি লাগত আর ও খিলখিল করে হেসে উঠত।

রাত্রে বৃষ্টির পরে প্রথম সকালে সামনের পাহাড়ের শিখর দিয়ে কাঁচা সোনা রঙের রোদ্দুর দেবদারুবনের উপরে এসে পড়ে— ও কাউকে না বলে আস্তে আস্তে গিয়ে সেই দেবদারুবনের নিস্তব্ধ ছায়াতলে একলা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, গা ছমছম করে— এই-সব প্রকাণ্ড গাছের ভিতরকার মানুষকে ও যেন দেখতে পায়। তারা কথা কয় না, কিন্তু সমস্তই যেন জানে। তারা-সব যেন অনেক কালের দাদামশায়, 'এক যে ছিল রাজা'দের আমলের।

ওর ভাবে-ভোলা চোখটা কেবল যে উপরের দিকেই তা নয়, অনেক সময় দেখেছি, ও আমার বাগানে বেড়াচ্ছে মাটির দিকে কী খুঁজে খুঁজে। নতুন অঙ্কুরগুলো তাদের কোঁকড়ানো মাথাটুকু নিয়ে আলোতে ফুটে উঠছে এই দেখতে তার ঔৎসুক্যের সীমা নেই। প্রতিদিন ঝুঁকে প'ড়ে প'ড়ে তাদেরকে যেন জিজ্ঞাসা করে, 'তার পরে? তার পরে? তার পরে?' তারা ওর চির-অসমাপ্ত গল্প। সদ্য গজিয়ে-ওঠা কচি কচি পাতা, তাদের সঙ্গে ওর কী যে একটা বয়স্যভাব তা ও কেমন করে প্রকাশ করবে। তারাও ওকে কী একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্য আঁকুপাঁকু করে। হয়তো বলে, 'তোমার নাম কী।' হয়তো বলে, 'তোমার মা কোথায় গেল।' বলাই মনে মনে উত্তর করে, 'আমার মা তো নেই।'

কেউ গাছের ফুল তোলে এইটে ওর বড়ো বাজে। আর-কারও কাছে ওর এই সংকোচের কোনো মানে নেই, এটাও সে বুঝেছে। এইজন্যে ব্যথাটা লুকোতে চেষ্টা করে। ওর বয়সের ছেলেগুলো গাছে ঢিল মেরে মেরে আমলকী পাড়ে, ও কিছু বলতে পারে না, সেখানে থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। ওর সঙ্গীরা ওকে খ্যাপাবার জন্যে বাগানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ছড়ি দিয়ে দু পাশের গাছগুলোকে মারতে মারতে চলে, ফস্ ক'রে বকুলগাছের একটা ডাল ভেঙে নেয়— ওর কাঁদতে লজ্জা করে পাছে সেটাকে কেউ পাগলামি মনে করে। ওর সব চেয়ে বিপদের দিন, যেদিন ঘাসিয়াড়া ঘাস কাটতে আসে। কেননা, ঘাসের ভিতরে ভিতরে ও প্রত্যহ দেখে দেখে বেড়িয়েছে— এতটুকু-টুকু লতা, বেগনি হলদে নামহারা ফুল, অতি ছোটো ছোটো ; মাঝে মাঝে কণ্টিকারি গাছ, তার নীল নীল ফুলের বুকের মাঝখানটিতে ছোট্ট একটুখানি সোনার ফোঁটা ; বেড়ার কাছে কাছে কোথাও-বা কালমেঘের লতা, কোথাও-বা অনন্তমূল ; পাখিতে-খাওয়া নিমফলের বিচি প'ড়ে ছোটো ছোটো চারা বেরিয়েছে, কী সুন্দর তার পাতা— সমস্তই নিষ্ঠুর নিড়নি দিয়ে দিয়ে নিড়িয়ে ফেলা হয়। তারা বাগানের শৌখিন গাছ নয়, তাদের নালিশ শোনবার কেউ নেই।

এক-একদিন ওর কাকির কোলে এসে ব'সে তার গলা জড়িয়ে বলে, 'ঐ ঘাসিয়াড়াকে বলো-না, আমার ঐ গাছগুলো যেন না কাটে।'

কাকি বলে, 'বলাই, কী যে পাগলের মতো বকিস। ও যে সব জঙ্গল, সাফ না করলে চলবে কেন।'

বলাই অনেক দিন থেকে বুঝতে পেরেছিল, কতকগুলো ব্যথা আছে যা সম্পূর্ণ ওর একলারই—ওর চার দিকের লোকের মধ্যে তার কোনো সাড়া নেই।

এই ছেলের আসল বয়স সেই কোটি বৎসর আগেরকার দিনে, যেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে নতুন-জাগা পঙ্কস্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়েছে— সেদিন পশু নেই, পাখি নেই, জীবনের কলরব নেই, চার দিকে পাথর আর পাঁক আর জল। কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ, সূর্যের দিকে জোড় হাত তুলে বলেছে, 'আমি থাকব, আমি বাঁচব, আমি চিরপথিক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করব রৌদ্রে-বাদলে, দিনে-রাত্রে।' গাছের সেই রব আজও উঠছে বনে বনে, পর্বতে প্রান্তরে, তাদেরই শাখায় পত্রে ধরণীর প্রাণ বলে বলে উঠছে, 'আমি থাকব, আমি থাকব।' বিশ্বপ্রাণের মূক ধাত্রী এই গাছ নিরবচ্ছিন্ন কাল ধরে দ্যুলোককে দোহন করে পৃথিবীর অমৃতভাণ্ডারের জন্যে প্রাণের তেজ, প্রাণের রস, প্রাণের লাবণ্য সঞ্চয় করে ; আর উৎকণ্ঠিত প্রাণের বাণীকে অহর্নিশি আকাশে উচ্ছ্বসিত করে তোলে, 'আমি থাকব।' সেই বিশ্বপ্রাণের বাণী কেমন-একরকম করে আপনার রক্তের মধ্যে শুনতে পেয়েছিল ঐ বলাই। আমরা তাই নিয়ে খুব হেসেছিলুম।

একদিন সকালে একমনে খবরের কাগজ পড়ছি, বলাই আমাকে ব্যস্ত করে ধরে নিয়ে গেল বাগানে। এক জায়গায় একটা চারা দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কাকা, এ গাছটা কী।'

দেখলুম একটা শিমুলগাছের চারা বাগানের ঘোরা-দেওয়া রাস্তার মাঝখানেই উঠেছে।

হায় রে, বলাই ভুল করেছিল আমাকে ডেকে নিয়ে এসে। এতটুকু যখন এর অঙ্কুর বেরিয়েছিল, শিশুর প্রথম প্রলাপটুকুর মতো, তখনই এটা বলাইয়ের চোখে পড়েছে। তার পর থেকে বলাই প্রতিদিন নিজের হাতে একটু একটু জল দিয়েছে, সকালে বিকেলে ক্রমাগতই ব্যগ্র হয়ে দেখেছে কতটুকু বাড়ল। শিমুলগাছ বাড়েও দ্রুত, কিন্তু বলাইয়ের আগ্রহের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। যখন হাত-দুয়েক উঁচু হয়েছে তখন ওর পত্রসমৃদ্ধি দেখে ভাবলে এ একটা আশ্চর্য গাছ, শিশুর প্রথম বুদ্ধির আভাস দেখবা-মাত্র মা যেমন মনে করে আশ্চর্য শিশু। বলাই ভাবল, আমাকেও চমৎকৃত করে দেবে।

আমি বললুম, 'মালীকে বলতে হবে, এটা উপড়ে ফেলে দেবে।'

বলাই চমকে উঠল। এ কী দারুণ কথা। বললে, 'না, কাকা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, উপড়ে ফেলো না।'

Scanned with CamScanner

আমি বললুম, 'কী যে বলিস তার ঠিক নেই। একেবারে রাস্তার মাঝখানে উঠেছে। বড়ো হলে চার দিকে তুলো ছড়িয়ে অস্থির করে দেবে।'

আমার সঙ্গে যখন পারলে না, এই মাতৃহীন শিশুটি গেল তার কাকির কাছে। কোল বসে তার গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'কাকি, তুমি কাকাকে বারণ করে দাও, গাছটা যেন না কাটেন।'

উপায়টা ঠিক ঠাওরেছিল। ওর কাকি আমাকে ডেকে বললে, 'ওগো, শুনছ ! আহা, ওর গাছটা রেখে দাও।

রেখে দিলুম। গোড়ায় বলাই না যদি দেখাত তবে হয়তো ওটা আমার লক্ষ্যই হত না। কিন্তু, এখন রোজই চোখে পড়ে। বছরখানেকের মধ্যে গাছটা নির্লজ্জের মতো মস্ত বেড়ে উঠল। বলাইয়ের এমন হল, এই গাছটার 'পরেই তার সব চেয়ে স্নেহ।

গাছটাকে প্রতিদিন দেখাচ্ছে নিতান্ত নির্বোধের মতো। একটা অজায়গায় এসে দাঁড়িয়ে কাউকে খাতির নেই, একেবারে খাড়া লম্বা হয়ে উঠছে। যে দেখে সেই ভাবে, এটা এখানে কী করতে। আরো দু-চারবার এর মৃত্যুদণ্ডের প্রস্তাব করা গেল। বলাইকে লোভ দেখালুম, এর বদলে খুব ভালো কতকগুলো গোলাপের চারা আনিয়ে দেব।

বললেম, 'নিতান্তই শিমুলগাছই যদি তোমার পছন্দ, তবে আর-একটা চারা আনিয়ে বেড়ার ধারে পুঁতে দেব, সুন্দর দেখতে হবে।'

কিন্তু কাটবার কথা বললেই বলাই আঁতকে ওঠে, আর ওর কাকি বলে, 'আহা, এমনিই কী খারাপ দেখতে হয়েছে।'

আমার বউদিদির মৃত্যু হয়েছে যখন এই ছেলেটি তাঁর কোলে। বোধ করি সেই শোকে দাদার খেয়াল গেল, তিনি বিলেতে এঞ্জিনিয়ারিং শিখতে গেলেন। ছেলেটি আমার নিঃসন্তান ঘরে কাকির কোলেই মানুষ। বছর-দশেক পরে দাদা ফিরে এসে বলাইকে বিলাতি কায়দায় শিক্ষা দেবেন বলে প্রথমে নিয়ে গেলেন সিমলেয়— তার পরে বিলেত নিয়ে যাবার কথা।

কাঁদতে কাঁদতে কাকির কোল ছেড়ে বলাই চলে গেল, আমাদের ঘর হল শূন্য।

তার পরে দু বছর যায়। ইতিমধ্যে বলাইয়ের কাকি গোপনে চোখের জল মোছেন, আর বলাইয়ের শূন্য শোবার ঘরে গিয়ে তার ছেঁড়া একপাটি জুতো, তার রবারের ফাটা গোলা, আর জানোয়ারের গল্পওয়ালা ছবির বই নাড়েন-চাড়েন ; এতদিনে এই-সব চিহ্নকে ছাড়িয়ে গিয়ে বলাই অনেক বড়ো হয়ে উঠেছে, এই কথা বসে বসে চিন্তা করেন।

কোনো একসময়ে দেখলুম, লক্ষ্মীছাড়া শিমুলগাছটার বড়ো বাড় বেড়েছে— এতদূর অসংগত হয়ে উঠেছে যে, আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। এক সময়ে দিলুম তাকে কেটে।

এমন সময়ে সিমলে থেকে বলাই তার কাকিকে এক চিঠি পাঠালে, 'কাকি আমার সেই শিমুলগাছের একটা ফোটোগ্রাফ পাঠিয়ে দাও।'

বিলেত যাবার পূর্বে একবার আমাদের কাছে আসবার কথা ছিল, সে আর হল না। তাই বলাই তার বন্ধুর ছবি নিয়ে যেতে চাইলে।

তার কাকি আমাকে ডেকে বললেন, 'ওগো শুনছ, একজন ফোটোগ্রাফওয়ালা ডেকে আনো।'

জিজ্ঞাসা করলুম, 'কেন।'

বলাইয়ের কাঁচা হাতের লেখা চিঠি আমাকে দেখতে দিলেন।

আমি বললেন, 'সে গাছ তো কাটা হয়ে গেছে।'

বলাইয়ের কাকি দুদিন অন্ন গ্রহণ করলেন না, আর অনেক দিন পর্যন্ত আমার সঙ্গে একটি কথাও কন নি। বলাইয়ের বাবা তাঁর কোল থেকে নিয়ে গেল, সে যেন ওঁর নাড়ি ছিঁড়ে ; আর ওর কাকা তাঁর বলাইয়ের ভালোবাসার গাছটিকে চিরকালের মতো সরিয়ে দিলে, তাতেও ওঁর যেন সমস্ত সংসারকে বাজল, তাঁর বুকের মধ্যে ক্ষত করে দিলে।

ঐ গাছ যে ছিল তাঁর বলাইয়ের প্রতিরূপ, তারই প্রাণের দোসর।

Scanned with CamScanner

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।

অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির-মাঝে।

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

Scanned with CamScanner

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতা-নাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।

Scanned with CamScanner

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম—প্রলয়-মন্থন-ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি, প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।

Scanned with CamScanner

স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে। অকস্মাৎ
পরিপূর্ণ স্ফীতি-মাঝে দারুণ আঘাত
বিদীর্ণ বিকীর্ণ করি চূর্ণ করে তারে
কাল-ঝঞ্ঝা-ঝংকারিত দুর্যোগ-আঁধারে।
একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান।

স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভ-ক্ষুধানল
তত তার বেড়ে ওঠে—বিশ্বধরাতল
আপনার খাদ্য বলি না করি বিচার
জঠরে পুরিতে চায়। বীভৎস আহার
বীভৎস ক্ষুধারে করে নির্দয় নিলাজ
তখন গর্জিয়া নামে তব রুদ্র বাজ।

ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে।
বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।

Scanned with CamScanner

তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে, প্রত্যেকের 'পরে
দিয়েছ শাসনভার, হে রাজাধিরাজ।
সে গুরু সম্মান তব সে দুরূহ কাজ
নমিয়া তোমারে যেন শিরোধার্য করি
সবিনয়ে, তব কার্যে যেন নাহি ডরি
কভু কারে।

Scanned with CamScanner

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গ-সম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে, আর, অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

Scanned with CamScanner

৮

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করে নি শতধা ; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

৯

শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন
দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন।
দেশ হতে দেশান্তরে স্পর্শবিষ তার
শান্তিময় পল্লী যত করে ছারখার।
যে প্রশান্ত সরলতা জ্ঞানে সমুজ্জ্বল,
স্নেহে যাহা রসসিক্ত, সন্তোষে শীতল,
ছিল তাহা ভারতের তপোবনতলে।

Scanned with CamScanner

বস্তুভারহীন মন সর্ব জলে স্থলে
পরিব্যাপ্ত করি দিত উদার কল্যাণ,
জড়ে জীবে সর্বভূতে অবারিত ধ্যান
পশিত আত্মীয়রূপে। আজি তাহা নাশি
চিত্ত যেথা ছিল সেথা এল দ্রব্যরাশি,
তৃপ্তি যেথা ছিল সেথা এল আড়ম্বর,
শান্তি যেথা ছিল সেথা স্বার্থের সমর।

Scanned with CamScanner

পরিভাষা

Abeyance স্থগিতকরণ
Abstract সার, বিমূর্ত, বস্তুনিরপেক্ষ
Abstract Budget সংক্ষিপ্ত বাজেট, আয় ব্যয়ক
Accident-prone দুর্ঘটনাপ্রবণ
Accountant General মহাগাণনিক
Adaptation অভিযোজন, সাঙ্গীকরণ, গ্রহণ
Ad hoc committee তদর্থক সমিতি
Adjourned sine die অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত স্থগিত
Adjournment মুলতুবি
Administrative প্রশাসনিক
Ad valorem duty মূল্যানুসারী শুল্ক
Advocate General মহাধিবক্তা
Aesthetics নন্দনতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব, কাব্যজিজ্ঞাসা
Agrarian ভৌম, কার্য, ভূমিজীবী, কৃষি-বিষয়ক
Agricultural census কৃষি-শুমারি, কৃষি-গণনা
Agricultural Co-operative Credit Society কৃষি-সমবায়-ঋণদান-সমিতি
Agronomy কৃষিবিদ্যা
Amendment সংশোধন
Amusement tax বিনোদন-কর, প্রমোদ কর
Anomalous ব্যত্যয়ী, অনিয়ত
Anti-corruption দুর্নীতি-নিরোধ
Appointing-Authority নিয়োগ-কর্তৃপক্ষ
Arbitration শালিসি, মধ্যস্থতা
Arboriculturist বৃক্ষপালনবিদ্
Archives লেখ্যাগার, মহাফেজখানা
Art Council চারুকলা পরিষদ্
Article অনুচ্ছেদ

Atomic Energy Commission পারমাণবিক শক্তি আয়োগ
Atticism এথেনীয় শিল্পরীতি, মার্জিত শৈলী
Audio-visual aid শ্রাব্য-দৃশ্য অবলম্বন
Auditor-General মহানিরীক্ষক
Autonomous স্বশাসিত
Back door policy দুর্নীতি, পশ্চাদ্দ্বার নীতি
Basic democracy বুনিয়াদি গণতন্ত্র
Basic pay মূল বেতন
Belles lettre রম্যরচনা
Benefit of doubt সন্দেহাবকাশ
Bidding নিলামডাক
Block Development Officer ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক
Blood-transfusion রক্ত পরিসঞ্চালন
Board of trustees অছিপর্ষৎ
Bourgeois পরশ্রমজীবী, পরশ্রমভোগী
Brackish water নোনা জল
Broadcasting সম্প্রচারণ
Cacology অশুদ্ধ শব্দপ্রয়োগ, ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণ
Calligraphist হস্তলিপিবিশারদ
Capital expenditure মুখ্য ব্যয়
Catharsis বিশোধন, মোক্ষণ, উপশম
Chauvinism জাত্যভিমান, উগ্র-স্বাদেশিকতা
Caste জাত
Casual আকস্মিক, নৈমিত্তিক
Censor Board বিবাচন পর্ষৎ
Charge sheet অভিযোগপত্র
Chief Election Commissioner নির্বাচন মহাধ্যক্ষ
Chief Engineer মুখ্য বাস্তুকার, মুখ্য যন্ত্রবিদ
Cheif Secretary মুখ্য সচিব
Chief Whip মুখ্য সচেতক
Chorus সম্মেলক সঙ্গীত
Civil disobedience আইন অমান্য
Cliche ছাঁচে ঢালা শব্দ, বাহুল্য বাগ্‌রীতি, জরাজীর্ণ শব্দ

Scanned with CamScanner

Coalition Government যৌথ সরকার, মিলিজুলি সরকার
Columnist স্তম্ভকার, সংবাদভাষ্যকার, কলামিট
Comptroller হিসাব-নিয়ামক
Confidential Assistant আপ্ত-সহায়ক
Connoisseur রসিক, সমঝদার, রসজ্ঞ
Connotation গূঢ়ার্থ, অন্তর্নিহিত অর্থ
Conservancy staff ময়লা-নিষ্কাশন কর্মিবৃন্দ
Contingent allowance উপনিমিত্ত ভাতা
Cut motion ছাঁটাই প্রস্তাব
Defamation মানহানি
Dehydration জলবিয়োজন
Demography জনতত্ত্ব
Demurrage বিলম্ব শুল্ক, বিলম্বজনিত খেসারত
Detenu রাজবন্দি
Director অধিকর্তা
Disbursing Officer ব্যয়ন আধিকারিক
Duet দ্বৈত-সঙ্গীত
Efficiency bar সামর্থ্যবাধ, যোগ্যতাগত বাধা
Elevator উত্তোলক
Embezzlement তহবিল তছরূপ
Essential Service অত্যাবশ্যক কৃত্যক
Fisheries Service মীনপোষ কৃত্যক
Forest Entomology বনকীটবিজ্ঞান
Free-lance Journalist বিলগ্ন-সাংবাদিক
Grant অনুদান, মঞ্জুরি
Grotesque অদ্ভুত, হাস্যোদ্দীপক
Habeas Corpus বন্দিপ্রদর্শন
Horticulture উদ্যানপালন
Human Rights মানবাধিকার
Hypothecated দায়বদ্ধ
Immigration অভিবাসন
Impasse অচলাবস্থা
Impulse প্রেরণা, আবেগ

Inevitable অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য
Industrial Tribunal শিল্পন্যায়পীঠ
Infrastructure পরিকাঠামো
Injunction আদেশাজ্ঞা, নিবারাজ্ঞা
Inscription plate উৎকীর্ণ ফলক
Interdepartmental আন্তর্বিভাগীয়
Interlingua আন্তর্জাতিক ভাষা
Jargon পেশাগত ভাষা, বৃত্তিগত ভাষা
Jurisdiction অধিকার ক্ষেত্র, এক্তিয়ার
Justice of the Peace ন্যায়পাল
Juvenile delinquency শিশু-অপরাধ
Know-how কৌশল, কৃৎকৌশল
Laissez faire অবাধ-নীতি, অবাধ বাণিজ্য
Letter of Guarantee প্রত্যাভূতিপত্র
Lexicon অভিধান
Lingua-franca মিশ্রভাষা
Linguistics ভাষাবিদ্যা
Malafide অসদ্‌বুদ্ধিকৃত
Maternity Leave প্রসূতি ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটি
Memorandum স্মারকলিপি
Modus Operandi ক্রিয়াপদ্ধতি
Modus Vivendi সাময়িক চুক্তি
Monogram অভিজ্ঞান
Mysticism অতীন্দ্রিয়তা, অতীন্দ্রিয়বাদ
Mythology পুরাবৃত্ত
Narcissism আত্মরতি
Nation রাষ্ট্র, জাতি
Nihilism অবিশ্বাসবাদ
Nomads যাযাবর
Note of Dissent ভিন্ন মন্তব্য
Note Sheet মন্তব্যপত্র
Notification প্রজ্ঞাপন
Obscene language অশ্লীল ভাষা

Scanned with CamScanner

Occidental পাশ্চাত্য, পাশ্চাত্য জগতের লোক
On a point of order বৈধতার প্রশ্নে
Ordinance অধ্যাদেশ
Osteology অস্থিবিজ্ঞান
Pagan বহুদেববাদী
Page make-up পৃষ্ঠাসজ্জা
Pantomime মূকাভিনয়
Paper under disposal বিবেচ্যপত্র
Paraphernalia আনুষঙ্গিকী
Pastoral poetry রাখালী কবিতা, গোষ্ঠীগীতি
Pedigree বংশবিবরণী, কুলুজী
Pensioner উত্তরবেতনভোগী, বৃত্তিভোগী
Pilot project অগ্রণী প্রকল্প
Plebiscite গণভোট
Posthumous মরণোত্তর
Power of Atorney মোক্তারনামা
Prima facie দৃশ্যত
Proletariat পরার্থশ্রমী, সর্বহারা, শ্রমজীবী
Prologue প্রস্তাবনা
Proper channel যথাযথ প্রণালী
Provident Fund ভবিষ্যনিধি
Proscenium রঙ্গমঞ্চের সম্মুখভাগ
Pseudonym ছদ্মনাম
Public Relations Officer জনসংযোগ আধিকারিক
Public Welfare জনকল্যাণ
Quack হাতুড়ে
Race জাতি, প্রবংশ, জাতিকুল
Rationalisation যুক্তিসংগত পুনর্গঠন
Realisation of Arrear Dues বকেয়া প্রাপ্য আদায়
Receptionist আপ্যায়ক/আপ্যায়িকা
Recommended and Forwarded সুপারিশ করে প্রেরিত হল
Recruiting Officer প্রবেশন আধিকারিক
Recurring Expenditure আবর্তক ব্যয়

Redundant অপ্রয়োজনীয়, অপিরিমিত, বাড়তি
Referendum গণভোট
Regionalism আঞ্চলিকতাবাদ
Relativism অপেক্ষবাদ
Remote control দূর-নিয়ন্ত্রণ
Requisitioned meeting তলবি সভা
Reserved Forest সংরক্ষিত বন
Reservoir জলাধার
Resurgence পুনরুত্থান ; পুনরুদয়, পুনরভ্যুদয়
Retrospective effect অতীত থেকে কার্যকর করা
Returning Officer নির্বাচন আধিকারিক
Revisionism শোধনবাদ, সংশোধনবাদ
Sabotage অন্তর্ঘাত
Saga বীরকাহিনী, বীরগাথা
Sanatorium স্বাস্থ্যনিবাস
Satellite town উপ-নগর
Schedule of expenditure খরচের তালিকা
Search-warrant তল্লাশি পরোয়ানা
Seasonal unemployment মরশুমি বেকারত্ব
Secularism লোকায়তিক, ধর্মনিরপেক্ষতা
Seismograph ভূকম্পলেখ
Select Committee প্রবর সমিতি
Service-book কৃত্যক-বই
Shibboleth বাগ্‌বৈশিষ্ট্য
Shipping Corporation পোতনিগম
Soil erosion Control ভূ-ক্ষয়-নিয়ন্ত্রণ
Solicitor General মহাব্যবহারদেশক
Solo একক সঙ্গীত
Sovereignty সার্বভৌমিকতা, সার্বভৌমত্ব
Sponsor পোষক
Stamp Duty মুদ্রাঙ্ক-শুল্ক
State of emergency জরুরি অবস্থা
Stream of consciousness চেতনাপ্রবাহ

Scanned with CamScanner

Strong Room দুর্ভেদ্য প্রকোষ্ঠ
Subject to approval অনুমোদন সাপেক্ষ
Sublimity মহত্ত্ব
Succession Certificate উত্তরাধিকার পত্র
Sundry expenses বিবিধ ব্যয়, রকমারি খরচ
Suo motu স্বত
Surrealism অতিবাস্তবতা, পরাবাস্তবতা
Suspense accounts তোলা হিসাব
Symbolist প্রতীকবাদী
Symphony একতান, ধ্বনিসাম্য
Synonym সমার্থ শব্দ, প্রতিশব্দ
Synopsis সংক্ষিপ্তসার, চুম্বক
Syntax বাক্যপ্রকরণ, পদবিন্যাস
Synthesis সংশ্লেষ, সমন্বয়
Technique গঠন-কৌশল, আঙ্গিক
Terminology পরিভাষা, পারিভাষিক শব্দ
Terms of Reference বিচার্য বিষয়
Testimonial শংসাপত্র
Test-tube Baby নলজাত শিশু
Theism আস্তিকতা, আস্তিকতাবাদ
Theory of Evolution অভিব্যক্তিবাদ
Theory of Relativity আপেক্ষিকতাবাদ
Through proper channel যথাযথ প্রণালী-মাধ্যমে
Title page নাম-পত্র
Toll Collector পারানি-সংগ্রাহক
To whom it may concern সংশ্লিষ্টের প্রতি
Trading Corporation বাণিজ্য-নিগম
Tradition ঐতিহ্য
Transparency স্বচ্ছতা
Treasury Officer কোষাগার আধিকারিক
Trustee অছি, ন্যায়রক্ষক
Ultimatum চরম পত্র, চরম প্রস্তাব, চরম দাবি
Under consideration বিবেচ্য, বিবেচনাধীন

Under-garment অন্তরীয়, অন্তর্বাস
Urban Development Project নগর উন্নয়ন প্রকল্প
Utilitarianism উপযোগবাদ, হিতবাদ
Valency যোজ্যতা
Velocity বেগ
Vanguard অগ্রদূত
Verbiage বাগাড়ম্বর, শব্দবাহুল্য
Veterinary পশুচিকিৎসা
Viscera আন্তরশারীর যন্ত্র
Vocational বৃত্তীয়
Warehouse পণ্যাগার, গুদাম
Warmonger যুদ্ধবাজ
Waste land reclamation পতিত জমি উদ্ধার
Water proof জলরোধক
Weather-chart আবহচিত্র
Welfare centre কল্যাণ-কেন্দ্র
Wilful neglect of duty ইচ্ছাকৃত কর্ম-অবহেলা
Within one's hearing শ্রুতিগোচর হয় এমনভাবে
Without prejudice অপক্ষপাত, অনিষ্টবর্জিত
Working Capital চালু মূলধন
Working journalist বার্তাজীবী
Xenophobia বিদেশী-বিদ্বেষ, বিদেশী-বিরোধিতা
Youth Welfare Officer যুব-কল্যাণ আধিকারিক
Zoinist ইহুদিবাদী
Zonal Office আঞ্চলিক কার্যালয়

Scanned with CamScanner